আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন

-ঃ লেখক ঃ-

ওহোল ডি. আর

(রাষ্ট্রীয় প্রচারক, বামসেফ)

অনুবাদকঃ জগদীশচন্দ্র রায়

আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন

লেখক ঃ ডি আর ওহোল

অনুবাদক ঃ জগদীশচন্দ্র রায়

হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রকাশনী
সিন্দ্রানী, বাগদা,
উত্তর চব্বিশ পরগণা।
পিন ঃ ৭৪৩২৯৭

SIDDHA BOOK CENTRE
Duramari, Jalpaiguri
Mob : 9775838579

উৎসর্গ

সকল মূলনিবাসী জনগণের উদ্দেশে-

অনুবাদকের কলমে

বইটির নাম দেখলেই পাঠকগণের মাথায় প্রশ্ন আসবে **'তাহলে কি আমরা স্বাধীন নই'?** আমারও এই প্রশ্ন মনে এসেছিল। বইটি ছোট হলেও সম্পূর্ণ পড়ার পর আমার প্রশ্নের সমাধান হয়। তখন ভাবি, বইটি বাংলার পাঠকদের কাছে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে আরো চেতনার বিকাশ ঘটবে। সেই আশায়, হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদের বইটি ২০১১ তে প্রকাশিত হয় বামসেফ-এর দ্বারা মূলনিবাসী পাবলিকেশন ট্রাস্ট থেকে। কিন্তু বর্তমানে মনে করছি, বইটির চাহিদা এখনো আছে। তাই বর্তমানে বইটিকে আরো সুন্দর করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বইটিতে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে যে তথ্য আছে সেটা আমি সংযোজন করেছি। কারণ গুরুচাঁদ ঠাকুরও ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতায় সহভাগী হননি। কেন হননি, সেবিষয়ে তথ্যও তুলে ধরেছি।

বইটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করলে আশাকরি, সঠিক উদ্দেশ্য অনুধাবন করা সম্ভব। বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের এই তথ্য জানা একান্ত দরকার।

আমরা যেটুকু অধিকার আজ ভোগ করছি সেটা মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাংলা থেকে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় পাঠানোর জন্য। বাবাসাহেব সংবিধানে মূলনিবাসীদের জন্য অর্থাৎ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং ধর্ম পরিবর্তিত লোকদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছেন। সেই অধিকার ভোগ করে তাঁরা নিজেদের স্বাধীন মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে মূলনিবাসীরা এখনো গোলাম হয়ে আছেন– মানসিক গোলাম। এই গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মূলনিবাসী বহুজন মহামানবদের বিচারধারাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার আন্দোলনের বিউগল বাজাতে হবে।

পূর্বের বইয়ের প্রচ্ছদ সামান্য এডিট করে একই প্রচ্ছদ রাখা হয়েছে। আর এই বইয়ের অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ করেছেন পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় সুধীর রঞ্জন হালদার মহাশয়। যিনি ৭৫ বছর বয়সেও নিরলসভাবে সমাজের কাজ করে চলেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। বইটির লেখক মাননীয় ডি আর ওহোলকে অভিনন্দন জানাই সমাজের কাছে এই সত্য ইতিহাস তুলে ধরার জন্য। বইটি যদি পাঠকগণের কাছে সমাদৃত হয় তবেই আমার চেষ্টা স্বার্থক হবে।

বিনীত-

মুম্বাই;

জগদীশচন্দ্র রায়

১৯ জুন; ২০২১

লেখকের কলমে

"আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন" পুস্তকটি মূলনিবাসী বহুজন সমাজের কর্মকর্তাদের ও শুভচিন্তকদের হাতে দিতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমাকে অনেকদিন ধরে একটি প্রশ্ন পীড়িত করছে। প্রশ্নটি হচ্ছে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে সমস্ত ভারতীয়রা যদি স্বাধীন হয়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল পরেও কেন ভারতে এত জাতিগত ভেদাভেদ বেড়ে গেছে? উঁচুনিচু, ধনী-গরিব, ইত্যাদি বৈষম্য কেন? একজনের চর্বি বাড়ছে অন্যজন খালিগায়ে খিদেপেটে রয়েছে কেন? একজন ধনবান অন্যজন ভিখারী কেন? আজও গ্রামের লোকেরা কেন বলে 'ইংরেজদের শাসন ভালো ছিল'? মোঘল, ইংরেজ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ, পতুর্গীজ তথা বহুজন প্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজত্বে একজন কৃষকও আত্মহত্যা করেছে এমন প্রমাণ নেই। সম্পূর্ণ ভারতে গম যোগান দেওয়া পাঞ্জাবের কৃষকরাও আত্মহত্যা করছে কেন? অমর্ত্য সেন বলেছেন, বৌদ্ধকালে সারা পৃথিবীতে উৎপাদনের ১০০ টাকার মধ্যে ভারতের উৎপাদন ৩১ টাকা ছিল। আজ সেই ভারতই ঋণে ডুবে গেছে। রাজা বলীর সময় ভারতে সোনার ধুঁয়া (অর্থাৎ অর্থে ভরপুর ছিল) বের হতো। আজ সেই ভারতের বম্বাচারীরা বম বিস্ফোরণ করে ধুঁয়া বের করছেন (শুধু মিথ্যার প্রতিশ্রুতির বন্যা)। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতকে সোনার চিড়িয়া বলা হতো। আজ সেই ভারতই কেন ভিখারি হয়েছে?

বলী রাজার সময়ে ডাকাতি, খুন, হত্যা এবং অন্যায় অত্যাচার হতো না। সেজন্য পুলিশ ছিল না। আজ সেই ভারতেই পুলিশ ফোর্স ও ন্যায়ালয় হওয়া সত্বেও চুরি-ডাকাতি, খুন-বলাৎকার, অন্যায়-অত্যাচার ও ভ্রষ্টাচার লেগেই আছে।

১৯৪৫ সালের আগে ভারতের একজন ব্যক্তিও দুনিয়ার ধনী সূচিতে ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে পৃথিবীর ধনীদের তালিকায় প্রথম দশ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান ভারতের। এরকম কেন? মূলনিবাসী বহুজন সমাজের কৃষকরা নিজের জীবনসাথীর জন্য কাপড় কিনতে চাইলেও তাকে অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে হয় কিন্তু মুকেশ আম্বানী নিজের স্ত্রীর জন্মদিনে তাকে ৩৫০০ কোটি টাকার হেলিকপ্টার উপহার দেয় কীভাবে? মুকেশ আম্বানীর বাবা ধীরুভাই আম্বানী গল্ফকান্ট্রীতে পেট্রল পাম্পে পেট্রল বেচতো। আজ দুনিয়ার ধনীদের লিস্টে দশ জনের মধ্যে তার ছেলে রয়েছে। আর এদিকে ভারতের কৃষকরা রাতদিন পরিশ্রম করেও গরিবি থেকে মুক্ত হতে পারছে না।

ভারতে প্রতিদিন মূলনিবাসী বহুজন সমাজের ৮৩ কোটি লোকের গড় আয় ৬ টাকা থেকে ২০ টাকা। সাড়ে বারো কোটি যুবক-যুবতী কর্মহীন। ১৬ কোটি লোক বস্তিতে ও রেললাইনের ধারে বসবাস করে। সাড়ে সাত কোটি শিশুশ্রমিক হিসাবে কাজ করে। ২৫% লোকদের আজও পানীয় জল মেলে না। মহিলারা অসুরক্ষিত। ৩০ লক্ষ লোক

ভিক্ষা করে জীবন কাটায়। তবুও আমরা স্বাধীন? আত্মহত্যাকারীর সূচিতে ব্যবসায়ী, নেতা, কর্মচারী নেই। শুধুমাত্র কৃষক শ্রমিকরাই রয়েছে। তবুও আমরা স্বাধীন কীভাবে? এরকম অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। সেজন্য আমার ভাবনাকে এই পুস্তকাকারে প্রকাশ।

বামসেফ, রাষ্ট্রীয় মূলনিবাসী সঙ্ঘ এবং ভারত মুক্তি মোর্চার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে চাই। যদিও মূলনিবাসী বহুজন সমাজের মানুষদের কাছে এটা মনে হতে পারে যে, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রয়োজন কেন? ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে আমাদের সমাজের লোকদের। এই বিশ্বাস সমাপ্ত করার জন্যই এই পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজের লোকদের ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার উপর থেকে বিশ্বাস দূর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মূলনিবাসী বহুজন সমাজের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে পারব না। সেজন্য মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন বিষয়টি বোঝানো দরকার।

বামসেফ, রাষ্ট্রীয় মূলনিবাসী সঙ্ঘ, ভারত মুক্তি মোর্চা, মারাঠা সেবাসঙ্ঘ, সম্ভাজী ব্রিগেড প্রভৃতি সংগঠনের কর্মকর্তারা এই পুস্তক লেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন। মারাঠী দৈনিক পত্রিকা 'জনতেচা মহানায়ক'-এ এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে যেসব শুভানুধ্যায়ী আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানান, তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এ ছাড়া এই পুস্তকটি প্রকাশ করতে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন বিশেষ করে করমালা ইউনিট, রাষ্ট্রীয় মুলনিবাসী সঙ্ঘ, মান্যবর দীপক কাম্বলে, যোগীরাজ ইংগলে, সতীশ কাম্বলে, বিশাল আহোলে, প্রশান্ত আম্বাদে ও অন্যান্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমি এই কাজ সুচারু রূপে করতে সমর্থ হয়েছি।

এই বইতে "আধুনিক ভারতের স্বাধীনতার দুই আন্দোলন" সম্পর্কে সম্পূর্ণ কথা লেখা হয়েছে সেই দাবি করছি না। তবে দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে হলে পৃথকভাবে দুটো আন্দোলনকেই গভীরভাবে অনুধাবন করা একান্ত দরকার। বর্তমানে মূলনিবাসী বহুজন সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা 'গোলামি'। আর এর সমাধান 'স্বাধীনতা'। সেজন্য আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। এই বইতে কিছু সমস্যা বা ত্রুটি থাকতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ত্রুটিকে বড় করে না দেখে বইটির বিষয় সম্পর্কে গঠনমূলক সুপরামর্শ দেবেন এই আশা করি। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এবং আন্দোলনের শিক্ষার মধ্যের পার্থক্যকে মাথায় রাখবেন। এই বইটি মূলনিবাসী বহুজন সমাজের দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এই বিশ্বাস রাখি।

জয় মূলনিবাসী

সূচিপত্র

আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন

আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন– এই বাক্যটি শোনা বা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে একটা কথা জেগে উঠবে, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আবার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে সমস্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তাহলে স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল পরেও এতো অসমানতা কেন? একদিকে অনিয়ন্ত্রিত ধন অন্যদিকে 'নির্ধন' এর যজ্ঞ কেন? বিশ্বের সব থেকে ধনীদের দশ জনের মধ্যে ভারতের স্থান অগ্রভাগে, আবার গরিবি রেখাও ভারতে সবার আগে কেন? এরকম হাজারো 'কেন' আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু আমাদের মূলনিবাসী জনগণ বিশেষ করে যারা সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে আরামের জীবন যাপন করছেন, 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে তাঁদের মনের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার জন্য, আর সমস্ত মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে জাগানোর জন্য এই লেখার আবশ্যকতা হয়েছে। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার প্রতি মূলনিবাসী বহুজন সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। সেই বিশ্বাসের প্রতি সঠিক তথ্য দিয়ে তাঁদেরকে জাগানো অত্যন্ত আবশ্যক। আর এর জন্য 'বামসেফ' এবং 'রাষ্ট্রীয় মূলনিবাসী সংঘ'-এর নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশে আমরা 'ভারত মুক্তি মোর্চা'-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন করতে চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মূলনিবাসী বহুজন সমাজের জনগণের মন থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস সমাপ্ত না হচ্ছে, যতক্ষণ আমাদের সমাজের লোকেরা বুঝতে পারছেন যে তাঁরা স্বাধীন নন, এখনো গোলাম হয়ে আছেন, ততক্ষণ দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন সফল হতে পারবে না। আর ততক্ষণ এই দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকবে। সেজন্য আধুনিক ভারতে স্বাধীনতার দুই আন্দোলন সম্পর্কে বহুজন সমাজকে বোঝানো একান্ত প্রয়োজন।

আজ মূলনিবাসী বহুজন সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে গোলামি। এই গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সব থেকে বড় সমাধান হচ্ছে স্বাধীনতা।

মূলনিবাসী বহুজন সমাজের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় ১৮৪৮ সালে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে। ভারতের অন্য প্রান্তে ঐ সময়ে বাংলায় মতুয়া ধর্মের আন্দোলন শুরু করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মূলনিবাসী মহামনীষী ও সন্তরা নিজেদের স্বাধীনতার আন্দোলন করেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মহারাষ্ট্রের গাড়ুগেবাবা, মাতা সাবিত্রীবাই ফুলে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, সাহু মহারাজ, আন্নাভাই সাঠে, বাবাসাহেব আম্বেদকর ও অন্যান্যরা। তামিলনাড়ুতে

আন্দোলন করেন ই ভি পেরিয়ার রামস্বামী। বাংলায় হরিচাঁদ ঠাকুরের আন্দোলনকে প্রভাবশালী করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। পরবর্তীতে এই আন্দোলন আরো এগিয়ে নিয়ে যান মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, পঞ্চানন বর্মন, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

মূলনিবাসী মহামনীষীদের স্বাধীনতার এই আন্দোলনকে সমাপ্ত করে দিয়ে ব্রাহ্মণরা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মূলনিবাসী বহুজনদের আন্দোলন এখনও অর্জিত হয়নি। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য আপনাদেরকে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তন-মন-ধন দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা আমাদের আত্মসম্মানের আন্দোলন। আন্দোলন যখন মূলনিবাসী বহুজনদের জন্য, তখন মূলনিবাসী বহুজনকেই এই আন্দোলন চালাতে হবে।

মূলনিবাসী বহুজন সমাজের সামনে আজ অনেক সমস্যা। আর এই সকল সমস্যাকে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা পরিকল্পিতভাবে তৈরি করেছে। **এই হাজারো সমস্যার মধ্যে বর্ণব্যবস্থা, জাতিব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা, আদিবাসীদের পৃথকীকরণ, ধর্মান্তরিত মূলনিবাসীদের অসুরক্ষা, মহিলাদের দাসত্ব– এই সব হচ্ছে প্রধান**। এর সঙ্গে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি আমাদের অন্যান্য প্রধান সমস্যা। এই সকল সমস্যার থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে গোলামির সমস্যা। আর এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্যই আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্পূর্ণ নতুন স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করতে হবে।

বাবাসাহবে ড. আম্বেদকর ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন–

১) যে ব্যক্তি তার নিজের সমাজের ইতিহাস জানে না, সে তার (সমাজের) ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। ২) যদি আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি তাহলে ইতিহাস আমাদের অবশ্যই শিক্ষা দেবে। অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে হলে আমাদের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে আমরা যে ভুল করেছি বা করছি তার বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমরা মূলনিবাসী বহুজন আমাদের ইতিহাস রচনা করতে চাই। তার জন্য যেভাবে ইতিহাস তৈরি হয়েছে তাকে জানতে ও বুঝতে হবে।

যাঁরা ভারতের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন তাঁরা ইতিহাস লেখেননি। কেন লেখেননি? কারণ লেখাপড়ার অধিকারই যাঁদের ছিল না, তাঁরা নিজেদের ইতিহাস লিখবে কী করে! যারা ইতিহাস নির্মাণ করেনি, তারাই ইতিহাস লিখেছে। কারণ ইতিহাস লেখার অধিকার তাদের হাতে ছিল।

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা ইতিহাসের নির্মাণ করেনি, কিন্তু তারাই ইতিহাস লিখেছে। তাই বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা যে ইতিহাস লিখেছে সেটা তাদের অনুকূলে লিখেছে। তারা তাদের বিজয়ের, গৌরবের, আত্মমর্যাদার ইতিহাস লিখেছে।

সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে, বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের পক্ষে লিখেছে।

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে বিকৃত ইতিহাস লেখার উদাহরণ

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ইতিহাস বিকৃতির ১ম উদাহরণঃ–

(ক) পেশোয়ারা সীমান্ত পর্যন্ত ঝাণ্ডা (পতাকা) লাগিয়েছে।

(খ) মারাঠাদের পানিপথ হয়েছে অর্থাৎ পরাজয় হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে 'পেশোয়া'-রা হচ্ছে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ। এই পেশোয়ারা প্রচার করে যে, তাদের 'ঝাণ্ডা' 'অটক'(অটক একটা জায়গার নাম, বর্তমানে সেটা পাকিস্তানে অবস্থিত) পর্যন্ত বিস্তার করেছিল। অর্থাৎ অটক নামক জায়গা পর্যন্ত তাদের শাসন ছিল। পেশোয়ারা এতটা দূর পর্যন্ত বিজয় লাভ করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তারা এটা প্রচার করে যে, মারাঠাদের পানিপথ হয়ে গেছে। অর্থাৎ মারাঠারা পরাজিত হয়েছে। তারা এমনভাবে প্রচার করে যে, মারাঠারা এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে যে, তারা মুখ দেখাতে পারছে না।

এই ধরনের কথা বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা কেন প্রচার করে? মহারাষ্ট্রের মানুষ হিসাবে সর্বপ্রথম তাদের পরিচয় হবে তারা মারাঠী। যেমন বাংলায় বসবাসকারী ও বাংলায় কথা বলার মানুষদের পরিচয় তারা বাঙালি। এই বাঙালি বলতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝায় না। এইভাবে প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীদেরকে সেই রাজ্যের ভাষাভাষী ও বসবাসকারীদের সমষ্টি হিসাবে বোঝায়। তার মধ্যে কোনো পৃথকীকরণ থাকে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পেশোয়া ব্রাহ্মণরা বিজয়ের কৃতিত্ব গ্রহণ করছে আর পরাজয়ের গ্লানি মারাঠীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু একটা আশ্চর্য কথা হচ্ছে যে, পানিপথে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার নেতৃত্ব সদাশিব রাও, বিশ্বাস রাও, চিমজী আঘা এরা করেছিল। আর এরা সকলে ছিল ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি কেন মারাঠাদের উপর চাপানো হয়েছে? এটা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এটা ওদের চালাকি। এটা ইতিহাসের বিকৃতিকরণ। বিজয় আমাদের (পেশোয়াদের) আর পরাজয় তোমাদের (মারাঠাদের)। অর্থাৎ পেশোয়া ও মারাঠারা পৃথক।

ভারতের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানদের সংঘর্ষের ইতিহাস নয়

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ইতিহাস বিকৃতির দ্বিতীয় উদাহরণঃ–

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা বলে যে, ভারতের ইতিহাস হিন্দু আর মুসলমানদের সংঘর্ষের ইতিহাস। আমরা মূলনিবাসী সমাজের লোকেরা সেই ইতিহাস

পড়ি এবং তাকে সত্যি বলে মেনে নিই। আর যেরকম লেখা আছে সেরকম বুঝি। কিন্তু এই ইতিহাস কি সঠিক ইতিহাস? এর সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দুজন সুফি-সন্ত ভারতে আসেন। একজন হচ্ছেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি, অন্যজন হজরত নিজামুদ্দিন। প্রথমজন আজ্মের ও রাজস্থানে আসেন দ্বিতীয় জন দিল্লীতে আসেন। এঁরা ভাইচারা আর সমতার প্রচার করেন। শান্তির বাণী দেন।

বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মুসলমানরা ব্রাহ্মণেতর সমাজের শত্রু নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণেতর সমাজের শত্রু হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। যার ফলে আমাদের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। বাস্তবে মুসলমানরা আমাদের শত্রু নয়। আমাদের আসল শত্রু হচ্ছে ব্রাহ্মণরা।

তর্কের খাতিরে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের কথামতো কিছুক্ষণ আলোচনার জন্য যদি ধরে নিই যে, মুলসমানরা আমাদের শত্রু– তাহলে প্রশ্ন আসে যে, **মুসলমান (ইসলাম) ভারতে আসার পূর্বে ভারতের মূলনিবাসী বহুজনদের শত্রু কারা ছিল? ঐ শত্রুদেরকে কারা খেয়ে ফেলল, না কি ঐ শত্রুরা মাটিতে মিশে গেল?** আমাদের মূলনিবাসী রাজা হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশ্যপ, বলীরাজা কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন? ঐ সব শত্রুরা এমনিতেই কি অদৃশ্য হয়ে গেছে? এর অর্থ ভারতের ইতিহাস হিন্দু আর মুসলমানদের সংঘর্ষের ইতিহাস নয়। এবার প্রশ্ন আসে– ভারতের ইতিহাস তাহলে কী? **ভারতের ইতিহাস– বর্ণব্যবস্থা সমর্থক আর বর্ণব্যবস্থা বিরোধীদের সংঘর্ষের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস অস্পৃশ্যতার সমর্থক আর বিরোধীদের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস অসমানতা, ভেদাভেদের সমর্থক আর বিরোধীদের সংঘর্ষের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আর বন্ধুত্ব-এর সমর্থক ও বিরোধীদের সংঘর্ষের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস সংরক্ষণের (প্রতিনিধিত্ব) সমর্থক আর বিরোধীদের সংঘর্ষের ইতিহাস।**

সংক্ষেপে যদি বলা হয়, তাহলে বলা যায় ভারতের ইতিহাস ব্রাহ্মণদের ইতিহাস কখনও ছিল না। এই বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা নিজেরাই ইতিহাস লিখে প্রচার করছে যে, ভারতের ইতিহাস হিন্দু মুসলমানদের সংঘর্ষের ইতিহাস।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে আমরা এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, ভারতের ইতিহাস হিন্দু আর মুসলমানদের সংঘর্ষের ইতিহাস নয়। এই সিদ্ধান্তকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।

মুসলমানরা মূলনিবাসীদের শত্রু নয়–

১। বর্ণব্যবস্থা কি মুসলমানরা নির্মাণ করেছে?

২। জাতিব্যবস্থা কি মুসলমানরা তৈরি করেছে?

৩। অস্পৃশ্যতা কি মুসলনদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে?

৪। সমাজের মধ্যে অসাম্য, উঁচুনীচু ভেদাভেদ কি মুসলমানরা সৃষ্টি করেছে?
৫। শূদ্র অতিশূদ্রদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে কি মুসলমানরা বঞ্চিত করেছে?
৬। হরিলীলামৃত গ্রন্থ প্রথমে ছাপাতে কি মুসলমানরা বিরোধ করেছিল?
৭। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কি 'যোগেন মোল্লা' গালি মুসলমানরা দিত?
৮। দেশভাগ ও বাংলাভাগ কি মুসলমানরা করেছিল?
৯। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ২০০৩ কি মুসলমানরা প্রচলন করেছে?
১০। মূলনিবাসী মহিলাদের কি মুসলমানরা গোলাম বানিয়েছে?

এরকম অনেক প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু চাল ফুটে ভাত হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকটি ভাত টিপে দেখার দরকার হয় না। দুচারটে টিপে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উপরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'না'। অর্থাৎ মুসলমানরা এসব করেনি। তাহলে আমাদের শত্রু মুসলমানরা হয় কি করে? অর্থাৎ মুসলমানরা মূলনিবাসী বহুজন সমাজের শত্রু নয়। এখন প্রশ্ন আসে আমাদের আসল শত্রু কে? উপরের প্রশ্নগুলোর কাজ যারা করেছে তারাই আসল শত্রু। উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর কাজ কারা করেছে? এর একমাত্র উত্তর বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা। তারাই আমাদের আসল শত্রু।

ইংরেজরা মূলনিবাসীদের গোলাম বানায়নি

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ইতিহাস বিকৃতির তৃতীয় উদাহরণঃ–

'ইংরেজরা ভারতের সব লোককে গোলাম বানিয়েছে'- এই মিথ্যা প্রচার বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা করা হয়েছে। ইংরেজরা কাদের গোলাম বানিয়েছে? ইংরেজরা যখন ভারতে আসে তখন যারা স্বাধীন ছিল, ইংরেজরা তাদেরই গোলাম বানিয়েছে। এরা ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ ও মোঘলদেরই গোলাম বানিয়ে ছিল। ইংরেজরা কিন্তু শূদ্র, অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য ও আদিবাসীদের গোলাম বানায়নি। কারণ যখন ইংরেজরা ভারতে আসে, তখন তারা দেখল যে এদেশে শুধুমাত্র ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ ও মোঘলরাই স্বাধীন আছে। সেজন্য ইংরেজরা এই দুই গোষ্ঠীকেই গোলাম বানিয়েছিল। অন্যদের গোলাম বানায়নি। কারণ অন্যরা অর্থাৎ শূদ্র, অতিশূদ্র, অস্পৃশ্যদের মালিক ছিল ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা। তাই ইংরাজরা এদের মালিককে গোলাম বানিয়েছিল। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা যখন ইংরেজদের গোলাম হয়ে গেল তখন এই শূদ্র, অতিশূদ্র ও অস্পৃশ্যরা ডবল গোলাম হয়ে গেল। কীভাবে? ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের গোলাম আর অন্যরা গোলামদের গোলাম। অর্থাৎ ডবল গোলাম। এই আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজরা আমাদের গোলাম বানায়নি।

এবিষয়ে আমরা বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর ও গান্ধিজির মধ্যে আলোচনা লক্ষ করতে পারি–

ড. আম্বেদকর– মিস্টার গান্ধি, স্বাধীনতার ব্যাপারে আপনি তো নৈতিকতার কথা বলেন। কিন্তু আপনারা তো আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছেন। তাই প্রথমে আমাদের স্বাধীন করুন, তারপর নৈতিকতার থেকে আপনাদের স্বাধীনতার কথা বলুন।

মি. গান্ধি– ড. আম্বেদকর, আমি তো ইংরেজদের গোলাম। আমি আপনাকে কি করে স্বাধীন করব? প্রথমে আমাকে ইংরেজদের থেকে স্বাধীন হতে দেন, তারপর আমি আপনাদের স্বাধীনতার বিষয়ে সহানুভূতির সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা করব।

ড. আম্বেদকর– মি. গান্ধি, আপনি তো ইংরেজদের গোলাম। আমরা শূদ্র অতিশূদ্ররা তো আপনাদের গোলাম। অর্থাৎ আমরা গোলামদের গোলাম। আপনি তো ইংরেজদের গোলাম কিন্তু আমাদের তো মালিক। আর পৃথিবীতে যে কোনো মালিক তার অধীন গোলামকে মুক্ত করার অধিকারী। (যদিও কোনো মালিক কোনোদিন কোনো গোলামকে মুক্ত করে না। মুক্ত করে দিলে মালিক আর মালিক থাকে না। গোলামকে তার গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংঘর্ষ করতে হয়।) তাই আপনি আমাদের মুক্ত করতে পারেন। তবুও আপনি আমাদের মুক্ত করছেন না।

আমরা মূলনিবাসী বহুজনরা যে ইংরেজদের গোলাম ছিলাম না বা ইংরেজরা আমাদের গোলাম বানায়নি তার প্রমাণ আমরা নিচের উদাহরণ থেকে গ্রহণ করতে পারি–

রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইংরেজদের চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন– *বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। আপনারা শিক্ষার জন্য আমাদের যে আর্থিক সহযোগিতা করছেন সেটা প্রয়োজনানুসারে যথোপযুক্ত নয়; তাই আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুব্যবস্থা করুন।*

এই চিঠিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে শূদ্র অতিশূদ্রদের শিক্ষার জন্য ইংরেজদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা দাবি করছেন।

আর অন্য দিকে আমরা দেখতে পাই যে, বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মগ্রন্থে শূদ্র অতিশূদ্রদের শিক্ষার অধিকারের প্রতি প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে রেখেছে। শিক্ষা থেকে লোক জাগরিত হয়। আর ইংরেজরা শূদ্র অতিশূদ্রের শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের লোককে জাগরিত করার কাজ তারা করছে। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মূলনিবাসী বহুজনদের মুক্ত হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতির নির্মাণ করার জন্য সহযোগিতা করছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, ইংরেজরা শূদ্র অতিশূদ্রদের গোলাম বানায়নি। বরং বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে আরও কিছু উদাহরণ আমরা গ্রহণ করতে পারি–

ইংরেজদের শাসনকালে অস্পৃশ্যরা সেনা বিভাগে ভর্তি হতে পারত। যার ফলে কিছু লোক সুবেদার জমাদার হতে পেরেছিলেন। এর জন্য সুবেদার রামজী আম্বেদকর, বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরকে লেখাপড়া শেখাতে পেরেছিলেন। বাবাসাহেব লেখাপড়া শিখে সমাজের শূদ্র অতিশূদ্র ও মহিলাদেরকে গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত সংঘর্ষ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণরা প্রচার করে যে, ইংরেজরা সমস্ত ভারতবাসীকে গোলাম বানিয়েছিল। এই মিথ্যা প্রচারের আড়ালে ব্রাহ্মণ তার শয়তানীকে ঢেকে রাখতে সমর্থ হয়। যার ফলে মূলনিবাসী বহুজন সমাজের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইংরেজরাই তাঁদের শত্রু। আর এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার ফলে মূলনিবাসী বহুজনরা ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য গান্ধি আর কংগ্রেসকে সহযোগিতা করেন।

ইংরেজরা মূলনিবাসীদের শত্রু নয়

এসব কথা জানার পর আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ইংরেজরা আমাদের যদি শত্রু না হয় তাহলে আমাদের শত্রু কে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

ইতিপূর্বে আমাদের শত্রু মুসলমানরা কি না সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো করেছি, সেই প্রশ্নগুলোতে মুসলমানের জায়গায় যদি ইংরেজ লিখে প্রশ্ন করি এবং তার সঙ্গে যদি আরো কিছু প্রশ্ন জুড়ে দিই তাহলে দেখা যাক তার উত্তর কি হতে পারে?

(ক) শূদ্র অতিশূদ্রদের শিক্ষা, সম্পত্তি ও অস্ত্রের অধিকার থেকে কি ইংরেজরা আমাদের বঞ্চিত করেছিল?

(খ) অস্পৃশ্যদের গলায় হাড়ি, কোমরে ঝাড়ু আর হাত ও পায়ে কালো সুতো বেঁধে রাখার নির্দেশ কি ইংরেজরা দিয়েছিল?

(গ) ধর্মের নামে মহিলাদের উপর সংস্কার ও নির্যাতনের নির্দেশ কি ইংরেজরা দিয়েছিল?

উপরোক্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'না'। এসব প্রশ্নের সকল উত্তর ঠিক কি না আপনারা বুঝে গেছেন আর এসব কারা করেছিল সেটাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে কোনো কিছুর ইশারাই যথেষ্ট হয়।

জাগরণ কাকে বলে বা কীভাবে করা সম্ভব

মূলনিবাসী বহুজন সমাজে জাগরণ ঘটানোর জন্য এতসব কথা বিশ্লেষণ করে লেখার প্রয়োজন হয়েছে। যে কোনো জাগরণমূলক কাজের পিছনে কিছু নীতি-নির্দেশ থাকে। সেটা থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। প্রশ্ন করতে পারেন– জাগরণ

কাঁকে বলে বা কীভাবে করা সম্ভব? **জাগরণের ক্ষেত্রে যে নীতি নির্দেশ আছে সেটা হচ্ছে-**

১। আসল শত্রুকে চেনা বা জানা দরকার।

২। প্রকৃত মিত্র বা বন্ধুকে জানতে হবে।

৩। শত্রুর শক্তি কোথায় কমজোর সেটা জানতে হবে।

৪। নিজেদের শক্তির কমজোর কোথায় সেটাও বুঝতে হবে।

৫। নিজেদের সঠিক ইতিহাসকে জানতে হবে।

লেখাপড়া শেখা অর্থাৎ একাডেমিক এডুকেশন-এ শিক্ষিত হওয়া বা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া আর নিজে জাগরিত হওয়া কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আপনি এম এ বা এম কম হতে পারেন। অথবা এম এস সি, এম ফিল, পিএইচ ডি-ও হতে পারেন। আবার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উকিলও হতে পারেন। প্রফেসরও হতে পারেন। মোটামুটি কথা আপনি ব্যক্তিগতভাবে উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য আপনি কি নিজেকে জাগরিত বলতে বা ভাবতে পারেন? আর আপনি নিজে বললেও সমাজ সেটা স্বীকার নাও করতে পারে। কারণ জাগরণ সামাজিক শিক্ষা থেকে আসে, নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার ফলে এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর সেটা যদি হতো তাহলে আমাদের মূলনিবাসী সমাজের আজ এই করুন অবস্থা হতো না।

এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিচ্ছি- মহারাষ্ট্রের সন্ত গাড়ুগে বাবা একজন থাম্‌স আপ অর্থাৎ টিপছাপ দেওয়া ব্যক্তি ছিলেন। এক কথায় ব-কলম। কিন্তু এই গাড়ুগেবাবা সামাজিক বিচার ধারায় শিক্ষিত ছিলেন। অর্থাৎ জাগরিত ছিলেন। তাই তো আজ মহারাষ্ট্রে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকে তাঁর উপর পিএইচডি করছেন। কার উপর? যিনি ব-কলম ব্যক্তি ছিলেন তাঁর উপর। কেন করছেন? কারণ তিনি জাগরিত ছিলেন। তিনি সমাজকে পরিবর্তন করার কাজ করেছিলেন সারাজীবন।

মহারাষ্ট্রের সমস্ত জনগণ কেশব সীতারাম ঠাকরেকে 'প্রবোধন কর' উপাধি দিয়েছেন। তাই লোকে তাঁকে প্রবোধনকর ঠাকরে নামেই সম্বোধন করে। তিনি ব্রাহ্মণেতর আন্দোলন বা মূলনিবাসী আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবিতকালে সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রে প্রবোধন করতেন। প্রবোধন কী? **সমাজের কল্যাণ, সমাজের উৎকর্ষ যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটা বিনা দ্বিধায় বোঝানোকে প্রবোধন বলে।** আর এ কাজই তিনি সারাজীবন করে গেছেন।

বাংলার মূলনিবাসীদের পতিত পাবন সমাজ সংস্কারক ঠাকুর হরিচাঁদ ও শিক্ষার অগ্রদূত গুরুচাঁদ ঠাকুরও ছিলেন জাগরিত ব্যক্তি। তাঁরাও আজীবন সমাজকে জাগানোর জন্য কাজ করে গেছেন। যদিও তাঁরা আপনার আমার মতো স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ডিগ্রীধারী নন। কিন্তু তবুও সকলে তাঁদের শ্রদ্ধা করেন।

তাঁদের নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন। তাদের নামে পিএইচডি করেন। কেন? তাঁরা জাগরিত ছিলেন। সমাজকে জাগানোর কাজ করেছেন। নিজেদের স্বার্থের প্রতি নিজেদের নাম যশের প্রতি কোনোদিন ফিরেও তাকাননি। আপনার আমার শিক্ষার অধিকারের জন্য তাঁরাই সংগ্রাম করেছিলেন বলে আজ স্কুলের চৌকাঠ পার করা যাচ্ছে। আপনি ভাবতে পারেন আপনার শিক্ষার জন্য আপনার পরিবারই সব করেছে। কিন্তু এতই যদি করতে পারেন তাহলে আপনার পিতা বা ঠাকুরদা বা তাঁর বাবা কেন শিক্ষিত হতে পারেননি? কারণ তখন শিক্ষার অধিকার ছিল না। আর আজ আপনি যেটা বলছেন যে আপনার শিক্ষার পিছনে আপনার পরিবার ছাড়া অন্য কারো অবদান নেই। এটা আপনার অহমিকা। আপনার সামাজিক শিক্ষার অন্তরায়ের ফল। আপনি কয়েকটি কাগজ জোগাড় করেছেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত হতে পেরেছেন কি?

আপনি কি জানেন গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণদের পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি নীচু জাত বলে। তাঁকে নিরুপায় হয়ে মক্তবে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি এই সামাজিক অবক্ষয়কে বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁর পিতার আদেশকে শিরোধার্য করে নিজে সামান্য শিক্ষিত হয়েও সমাজকে সুশিক্ষিত করার জন্য আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন-

"খাও বা না খাও তা'তে কোন দুঃখ নাই।
ছেলে পিলে শিক্ষা দেও এই আমি চাই।।"

(গুরুচাঁদ চরিত, পৃ-১৪৪)

"ছেলে মেয়েকে দিতে শিক্ষা
প্রয়োজনে করবে ভিক্ষা।।"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অশিক্ষা হচ্ছে মারণ ব্যাধি। তাই তিনি খেতে না পাওয়ার কষ্টের থেকে অশিক্ষার অভাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। খাদ্যকষ্টের যন্ত্রণাকে সহ্য করতে পারলেও শিক্ষা স্বরূপ খাদ্য থেকে বঞ্চিতের যন্ত্রণাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। কারণ, এটা দেশ ও সমাজের প্রগতির অন্তরায় স্বরূপ। যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি সন্তানকে শিক্ষিত করার কথা বলেছেন। প্রয়োজনে ভিক্ষা করেও সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্য আন্দোলন করেছেন। তিনি শুধু বাণী দিয়ে বসে থাকেননি। নিজে শিক্ষার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যার ফলে **আমরা বর্তমানে বাংলার দশম শ্রেণির 'স্বদেশ পরিচয় ও পরিবেশ' বইতে দেখতে পাই "তাঁর উদ্যোগে ৩৯৫২ টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়"**।

তিনিও ব্রাহ্মণদের শয়তানী চালকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজকে জাগাতে হলে সমাজের লোককে প্রথমে শিক্ষিত করতে হবে। কারণ শিক্ষা থেকে চেতনার উদয় হয়, ভাল মন্দ বিচার করার বুদ্ধি হয়। যে ব্রাহ্মণরা

আমাদের মূলনিবাসী সমাজকে শিক্ষার আলো থেকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য শিক্ষার অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি সকলকে লেখাপড়া শেখানোর আহ্বান করেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর কতটা যুগের অগ্রগামী ছিলেন আমরা তাঁর কথায় দেখতে পাই-

"যে ধর্মে নেই রাজা সে ধর্ম নয় তাজা।"

অর্থাৎ আপনাকে শুধু শিক্ষা গ্রহণ করলেই হবে না। আপনাকে রাজক্ষমতা দখল করতে হবে। কারণ রাজক্ষমতার মাধ্যমেই সমস্ত অধিকার পাওয়া যায়। যদিও রাজক্ষমতা অর্জন করার সূত্র হচ্ছে– বিচার পরিবর্তন। বিচার পরিবর্তনই হচ্ছে সমস্ত পরিবর্তনের মূল। তাই বিচার পরিবর্তন হলে আপনার আচরণের পরিবর্তন হবে। আচরণের পরিবর্তন হলে সমাজ পরিবর্তন হবে। সমাজ পরিবর্তন হলে ক্ষমতার বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। ক্ষমতার পরিবর্তন হলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে।

তবে একটা কথা– এই সূত্রকে অতিক্রম করে যদি আপনি ক্ষমতা পেতে চান তাহলে কিন্তু আপনি ক্ষমতা হাতে পেয়েও সফল হতে পারবেন না।

উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সেগুলো হচ্ছে–

১। মুসলমানরা ব্রাহ্মণেতর সমাজকে অর্থাৎ মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে গোলাম বানায়নি। তাই মুসলমানরা আমাদের শত্রু নয়।

২। ইংরেজরা ব্রাহ্মণেতর সমাজকে অর্থাৎ মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে গোলাম বানায়নি। তাই ইংরেজরাও আমাদের শত্রু নয়।

৩। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রাহ্মণেতর সমাজকে অর্থাৎ মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা বর্ণব্যবস্থা, জাতব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা, আদিবাসীদের পৃথকীকরণ, ধর্মান্তরিত মূলনিবাসীদের নিরাপত্তার অভাব আর মহিলাদের গোলামি এগুলোর মাধ্যমে গোলাম বানিয়েছে। তাই বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরাই আমাদের আসল শত্রু।

৪। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা মিথ্যা ইতিহাস লেখার ফলে অর্থাৎ বিকৃত ইতিহাস লেখার ফলে শত্রু আর মিত্রের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। যার জন্য ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা এখানকার ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ মূলনিবাসী লোকদেরকে ইংরেজ আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। আর যারা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয় তাদের কল্যাণ হওয়া কখনও সম্ভব নয়।

৫। আমাদেরকে আমাদের সঠিক ইতিহাস খুঁজে বের করতে হবে। আর একাজ আমাদেরকেই করতে হবে। এর জন্য ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ভারতে যে স্বাধীনতার দুটো আন্দোলন চলেছে, তার **একটা হচ্ছে– ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলন**। এই আন্দোলন ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। **দ্বিতীয়টা হচ্ছে– মূলনিবাসী মহামানবদের স্বাধীনতার আন্দোলন**। এই আন্দোলন বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

বর্ণব্যবস্থা, জাতব্যবস্থা আর অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মূলনিবাসী মহামনীষীরা স্বাধীনতার আন্দোলন করেছিলেন। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস লিখে শুধুমাত্র তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছে। এটা তাদের দ্বারা বিকৃত ইতিহাসের সঙ্গে চালাকি ছিল। তাদের লেখা ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে, তারা সবসময় তাদের সুবিধার কথাই লিখেছে আর যাতে তাদের ক্ষতি হবে, সে কথার কোনো উল্লেখই করেনি। কারণ এতে তাদেরই লাভ হয়েছে। কিন্তু মূলনিবাসী বহুজনদের এতে লাভ তো দূরের কথা বদনাম আর ক্ষতি হয়েছে। তাই আমাদের ইতিহাস আমাদেরকেই লিখতে হবে। ব্রাহ্মণরা যেটাকে লুকিয়ে রেখেছে, আমরা সেটাকে সবার সামনে তুলে ধরব। অর্থাৎ **If They hide it, We must highlight.**

পাঠান মোঘলরা প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর ভারত শাসন করেছে, তখন ব্রাহ্মণরা তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন কেন করেনি

১। পাঠান মোঘলরা ভারতে প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর শাসন করেছিল। এই সুদীর্ঘকাল ধরে বিদেশী ইউরেশিয়ানরা পাঠান মোঘলদের বিরুদ্ধে একবারও স্বাধীনতার আন্দোলন করেছে, এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন?

২। ইংরেজরা প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত ভারতে শাসন করেছিল। কিন্তু বাস্তবিক হিসাবে ১৮১৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১২৯ বছর ইংরেজরা ভারতকে শাসন করেছে। কিন্তু এই সময়ে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়েছিল কেন?

পাঠান মোঘলদের প্রায় সাড়ে ছয়শো বছরের রাজত্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলন না করার পিছনে তিনটি কারণঃ–

১। পাঠান মোঘলদের রাজত্বকালে তাদের শাসন প্রশাসনে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ৩৮% ভাগিদারী ছিল। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব বা রিজারভেশন ছিল।

যে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের জনসংখ্যা ছিল ৩.৫%, মোঘলদের শাসন প্রশাসনে তারা ছিল ৩৮%। সেজন্য এই বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা মোঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করেনি।

২। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে শাসনকার্য চালানোর নির্দেশঃ–

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা মোঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন না

চালানোর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে– বাবর একটা বসিয়তনামা লিখেছিলেন। বসিয়তনামা অর্থাৎ উইল। ঐ উইলে এক নসিয়তও লিখেছিলেন। নসিয়ত অর্থাৎ উপদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ। বাবর তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিখেছিলেন কীভাবে তারা শাসনকার্য চালাবে সে ব্যাপারে। সেখানে লেখা হয়েছে যে, যদি ভারতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শাসন করতে চাও তাহলে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শাসন করবে। বাবর তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে শাসন করার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। এরকম ব্যবস্থা যেখানে আছে, তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালানোর কোনো প্রয়োজন আছে কি? এজন্যই পাঠান মোঘলদের সাড়ে ছয়শো বছরের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণরা স্বাধীনতার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর আজ এই ব্রাহ্মণরা বাবরের দ্বারা নির্মিত মসজিদকে কলঙ্ক মনে করছে। তাকে ভেঙে ফেলছে। সব সময় এই বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ছল চাতুরীকে সঠিকভাবে বোঝা দরকার। প্রতিনিয়ত এরা কাজের পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে কিন্তু উদ্দেশ্য কখনও বদলায় না।

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অব্রাহ্মণ লোকদের অর্থাৎ মূলনিবাসী বহুজন সমাজের লোকদেরকে সব সময় গোলাম করে রাখা আর এই লোকদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকটি কাজই তাদের এই উদ্দেশ্যের জন্য করে। তাই মূলনিবাসী বহুজন সমাজের লোকেরা যত দ্রুত ব্রাহ্মণদের এই শয়তানী বুঝতে পারবেন, তত দ্রুত তাঁরা তাদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

৩। মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলন না চালানোর তৃতীয় মুখ্য কারণ আকবর দ্বারা জাতিগত কাজ নিরীক্ষণের জন্য পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্তিকরণ।

আকবর তাঁর রাজত্বকালে পুলিশ ইন্সপেক্টর (নিরীক্ষক) নিযুক্ত করেছিলেন। কেন? আকবরের রাজত্বকালে লোক জাতভিত্তিক তাদের ব্যবসা ও ব্যবহার করছে কি না সেটা দেখার জন্য। আর যদি কেউ তার জাতিগত ব্যবসা ও ব্যবহার না করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ ছিল। উদাহরণ হিসাবে মালী বাগানে ফলফুল ও সব্জি উৎপন্ন করে কিনা, কুমোর মাটির বাসনপত্র বানায় কিনা, ছুতোর কাঠের কাজ করে কিনা, স্বর্ণকার অলংকার বানানোর কাজ করে কিনা, প্রামাণিক চুলদাড়ি কাটার কাজ করে কিনা, ধোপা পুরানো কাপড় ধুয়ে শুকানো ও ইস্ত্রি করে কিনা, তেলি তেল তৈরির কাজ করে কিনা, দর্জি কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে কিনা, মাহার (তপশিলি) মরা পশুর চামড়া ছাড়ায় কিনা, চামার জুতো বানানো ও সেলাইয়ের কাজ করে কিনা ইত্যাদি দেখার জন্য আকবর পুলিশ নিরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। আমরা জানি যে, পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হয় অপরাধীদের ধরে শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু আকবর তাঁর শাসনকালে পুলিশ ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত

করেছিলেন লোক জাতিগত কাজ করছে কিনা সেটা দেখার জন্য। এর অর্থ আকবর জাতব্যবস্থাকে সুদৃঢ় রাখার জন্য একাজ করেছিলেন। এর থেকে আমরা একথা বুঝতে পারি যে, আকবর ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে মজবুত করার কাজ করেছিলেন। যেখানে এরকম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে ব্রাহ্মণদের মোঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালানোর কোনো প্রয়োজন আছে কি? এ জন্যই ব্রাহ্মণরা মোঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালায়নি।

জাতিব্যবস্থা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের আত্মা। কারণ জাতির অস্তিত্বের উপরই ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। জাতিব্যবস্থা ব্রাহ্মণদের শেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মতবাদকে স্থাপিত করে। যদি জাতিপ্রথা সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে বিদেশী ইউরেশিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। জাতি নষ্ট তো ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট। জাতিপ্রথার বিলুপ্তি তো ব্রাহ্মণদের আধিপত্যেরও বিলুপ্তি হওয়া নিশ্চিত। সেজন্য ব্রাহ্মণ 'জাতিপ্রথা' নষ্ট হতে দিতে চায় না। ২৫০০ বছর ধরে ব্রাহ্মণরা এই কথাটিকেই মাথায় রেখে তাদের উদ্দেশ্যকে পুর্ণ করার কাজ করছে এবং সাফল্য লাভ করছে। বাবাসাহবে ড. আম্বেদকর বলেন– "**ব্রাহ্মণ অন্য সব ধরনের আন্দোলন চালায় কিন্তু জাতিপ্রথা বিলুপ্তি করার আন্দোলন কখনও চালায় না।**" কোনো সতর্ক ব্যক্তি কখনও তার পায়ে কুড়াল মারে না। আপনি কোনো ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সে বর্ণব্যবস্থা চায়, না দেবতা চায়? তখন ব্রাহ্মণ বলবে সে কোনো দেবতা চায় না, শুধু বর্ণব্যবস্থাই চায়। কারণ বর্ণব্যবস্থা ব্রাহ্মণকে সবার মাথার উপর বসিয়ে রাখে। দেবতারাও একাজ করতে পারবে না।

জাতি ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা ও তাকে দীর্ঘজীবি করার জন্য আকবর কাজ করেছিলেন। সেজন্য বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা পাঠান মোঘলদের সাড়ে ছয়শো বছরের শাসনকালে তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালায়নি।

ইংরেজরাজত্বে কেন ব্রাহ্মণরা স্বাধীনতার আন্দোলন করেছিল

প্রথম কারণ– BRAHMIN PENAL CODE এর পরিবর্তে INDIAN PENAL CODE চালু করা।

১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট কোম্পানী আইন অনুসারে ইংরেজরা নন্দকুমার দেব নামক ব্রাহ্মণকে ফাঁসি দিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণকে ফাঁসি দেওয়া এটা ছিল প্রথম ঘটনা। এর ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণদের কাছে একটা বড় ধাক্কা লাগে। কাউকে হত্যা করার অপরাধে নন্দকুমার দেবকে ইংরেজরা ফাঁসি দিয়েছিল। ১৭০০ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করার জন্য ভারতে আসে। আর যেখানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সেখানে তাদের আইন চলত। যাকে কোম্পানী আইন বলা হত। এই আইন অনুসারে তারা ব্রাহ্মণকে ফাঁসি দিয়েছিল। ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে

একটা ভূমিকম্পের মত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারল যদি ইংরেজরা ভারতে থাকে তাহলে তারা অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেবে। সে শাস্তি ফাঁসিও হতে পারে। এরকম হলে ভারতে ব্রাহ্মণদের টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই ব্রাহ্মণরা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর পরিকল্পনা করে। মনুস্মৃতি অনুসারে কোনো ব্রাহ্মণ কোনো অপরাধ করলে খুব বেশি তাকে তার 'টিকি' কেটে নিয়ে সাজা দিত। কিন্তু ইংরেজরা তো সরাসরি ফাঁসি দিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের আইন হচ্ছে BPC অর্থাৎ BRAHMIN PENAL CODE. সেটা হচ্ছে মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতির আইন হচ্ছে শুধু ব্রাহ্মণদের সুবিধার জন্য। আর বাকিদের ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য। ইংরেজদের আইন ছিল IPC অর্থাৎ INDIAN PENAL CODE. অর্থাৎ সবার জন্য সমান। All are equal before law.

যখন ইংরেজরা নন্দকুমার নামক ব্রাহ্মণকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির শাস্তি দেয় তখন ভারতের সমস্ত ব্রাহ্মণ এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা হচ্ছে বর্তমানকালে মূলনিবাসী বহুজন সমাজের ১৬৬৩২ জন কৃষক তাদের ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। বর্তমানে সংসদে SC ST-দের ১২৬ জন ও OBC-দের ২০০ জন এবং মুসলমান ১৮ জন সাংসদ আছে (২০১০ অনুসারে)। সব মিলিয়ে ৩৪৪ জন সাংসদ আছে। ৫৪৪ এর মধ্যে ৩৪৪ সাংসদ তো বহু সংখ্যা। কিন্তু SC SC OBC-দের কোনো সাংসদ কি কৃষকদের এই বিষয়ের প্রতি সংসদে প্রতিবাদ করেছে সরকারের বিরুদ্ধে? এটা হচ্ছে আমাদের একতা! বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা আলাদা আলাদা পার্টিতে আছে। কিন্তু তারা একত্রিত আছে তাদের সুবিধার জন্য। আর আমরা একপক্ষের হয়েও আলাদা আলাদা। এটা হচ্ছে আমাদের এবং আমাদের শত্রুদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

ব্রাহ্মণরা আলাদা আলাদা পার্টিতে থাকা সত্বেও তারা তাদের জাতিবন্ধুদের ভালোর জন্য কাজ করে। আর আমরা একপক্ষের হওয়া সত্বেও জাতিবন্ধুদের বিরুদ্ধে কাজ করি!

দ্বিতীয় কারণঃ– ইংরেজ কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা।

ইংরেজরা প্রথমে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তারপর চেন্নাই ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। সংক্ষেপে ভারতের পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ইংরেজরা ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে এটা ভাবতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের রাগে পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ইংরেজরা ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে তার জন্য ব্রাহ্মণদের আনন্দ হওয়া উচিত। এই কাজ করার জন্য ইংরেজদের অভিনন্দন করা উচিত ছিল ব্রাহ্মণদের। কিন্তু তারা ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর রণনীতি তৈরি করে। বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা এটা কেন করল?

ব্রাহ্মণরা বিচার করল যে, তারা যেখানে ভারতের মূলনিবাসী শূদ্র অতিশূদ্রদের এক অক্ষরেরও জ্ঞান দিতে চায়নি। আর সেখানে ইংরেজরা কিনা এখানকার লোকদের বিশ্বের জ্ঞান প্রদান করছে? এটা তো মোটেই ঠিক নয়। এটা তো কোনো যোগ্য কাজ নয়। এখানকার মূলনিবাসীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে না পারে তার জন্য তো তারা ধর্মগ্রন্থ লিখে এদের শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা এদের বিশ্বের জ্ঞান প্রদান করছে এটাতো ব্রাহ্মণ্যনীতির বিরোধী কাজ। কোনো মূলনিবাসী লেখাপড়ার জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণরা তার মাথাকে ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আর এই ইংরেজরা বিশ্বের জ্ঞান প্রদান করছে? এটা তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণদের কোনো প্রতিমাকেও কেউ গুরু মনে করে কোনো মূলনিবাসী আদিবাসী ধনুর্বাণ চালানোর বিদ্যা অর্জন করলেও ব্রাহ্মণরা তার বাম হাত নয়, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কেঁটে নিয়েছে। যাতে জীবনে সে আর কোনো দিন ধনুর্বান চালানোর যোগ্য হতে না পারে। আর ইংরেজরা কিনা এখানকার মূলনিবাসীদের জন্য বিশ্বের জ্ঞান প্রদানের কাজ করছে এটাতো গুরু আর শিষ্যের পরম্পরার বিরোধী। অতএব ইংরেজদের ভারত থেকে যত তাড়াতাড়ি বিতাড়িত করা যায় ততই ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে মঙ্গল জনক।

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা আরো ভাবলো যে তারা এখানকার মূলনিবাসীদের অক্ষর জ্ঞানও দিতে চায় না, তবুও এখানকার লোকেরা ব্রাহ্মণদের পায়ে পড়ে, পা ধুয়ে তীর্থ মনে করে জল খায়। ব্রাহ্মণদের দেবতা বলে। সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ব্রাহ্মণদের ছাড়া কোনো কর্মই করে না। নিজে উপবাসী থেকে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেয়। ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করে। ব্রাহ্মণকে 'অতিথি দেবো ভবঃ' মনে করে। পরমেশ্বের মনে করে পূজা করে। এরকম লোকেরা যদি বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাহলে তো ব্রাহ্মণদের জন্য সাড়ে সর্বনাশ!

এরকম ঘটতে থাকলে তো একসময় ব্রাহ্মণদের এরা দেবতা মনে করবে না। পা ধুয়ে জল খাবে না। সম্মান করবে না। আর ব্রাহ্মণদের দিয়ে কোনো ধর্মীয় কাজও করাবে না। আর ধর্মীয় কাজ না করালে তো দক্ষিণা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এক কথায় চোখ বন্ধ করে ব্রাহ্মণদের সব কিছু মেনে নেবে না বা বিশ্বাসও করবে না। ফলে ব্রাহ্মণদের কল্যাণ তো দূরের কথা, সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহলে এসব যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য এই ইংরেজদেরই তাড়াতে হবে।

বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের পরিধি কতটা? তাদের কি ধরনের জ্ঞান আছে? এদের ব্রক্ষজ্ঞান আছে। যদি মূলনিবাসী বহুজনরা বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করে তাহলে ব্রাহ্মণদের এই ব্রক্ষজ্ঞান দিয়ে কি করবে? ব্রক্ষজ্ঞান মহান না বিশ্বজ্ঞান মহান? অবশ্যই বিশ্বজ্ঞান মহান। যখন মূলনিবাসীরা বিশ্বের এই মহান জ্ঞান লাভ করবে, তখন এরা কি ব্রাহ্মণদের পাত্তা দেবে? বিদ্বান বলে কি তাদের মানবে?

তাদের দিয়ে কি ধার্মিক কাজ করাবে? ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে কি একাদশী করবে, আমাবস্যা করবে, কোন উৎসব কীভাবে পালন করতে হবে– এসব কি জানতে চাইবে? যদি মূলনিবাসীদের বিশ্বের জ্ঞানলাভ হয় তাহলে এরা উপরোক্ত কোনো কাজই ব্রাহ্মণদের দিয়ে কখনো করবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, মর্যাদা ও বিনাশ্রমের উপার্জনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেবে। এসবের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করে ছিল ব্রাহ্মণরা।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে টমাস পেইন-এর **"Human Rights"** অর্থাৎ 'মানবিক অধিকার' নামক বিপ্লবী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপরই তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর **'সত্য শোধক সমাজ'** স্থাপন করেন। তারপর মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শাহু মহারাজ ইংলণ্ডে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দেশে ফিরে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ত্যাগ করে সত্যশোধক সমাজে যোগদান করেন এবং মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।

মহামানব বাবাসাহেব আম্বেদকর ইংলণ্ডে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করেন আর বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের ধর্মকে অস্বীকার করেন। তিনি মূলনিবাসী ভূমিপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের 'ধম্ম'কে স্বীকার করেন।

ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও তার পরিসীমা

ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের জ্ঞান কতটা সেটা বুঝাবার জন্য তারা একটা ধর্মগ্রন্থ লিখেছে, যার নাম হচ্ছে 'গীতা'। এই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে ভগবান বলা হয়– সেই শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন? **'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ ....'** অর্থাৎ যখন যখন ধর্মের গ্লানিতে ভারতবর্ষ ভরে যাবে অর্থাৎ ভারতে যদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংকটাপন্ন হয়ে যায়, সেই সংকটকে দূর করার জন্য আমি ভারতে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করব। কিন্তু ভারতের বাইরের কোনো দেশে যদি ব্রহ্মণ্যধর্ম সংকটে পড়ে, ধরুন শ্রীলংকায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংকটে পড়ে গেল, আমেরিকায়, জাপানে তাদের ধর্মসংকট উপস্থিত হল, তাহলে কে সেই সংকট থেকে মুক্ত করবে?

শ্রীকৃষ্ণ তো শুধু ভারতের ধর্মসংকটকে মুক্ত করার জন্য অবতার হবেন। বাইরের দেশের ধর্মসংকটের দায়িত্ব তো তিনি নেবেন না। এর অর্থ ভারতবর্ষ ব্যতীত দুনিয়া আছে, ভারতের বাইরে কোনো দেশ আছে– এ বিষয়ের জ্ঞান এই শ্রীকৃষ্ণের নেই! এটা হচ্ছে এই ভগবানের জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান! এখন প্রশ্ন আসে শ্রীকৃষ্ণের এই সীমিত জ্ঞান কেন? তিনি ভগবান বলে? দেবতা বলে? না কি অন্য কিছু তিনি? এটা অবশ্যই অন্য কিছু। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে বর্ণব্যবস্থা, জাতিব্যবস্থা কুসংস্কার ইত্যাদি– এসব কিছুই ভারতে আছে অন্যত্র নেই। তাই এই ধর্মকে বাঁচানোর জন্য ব্রাহ্মণ্যরাই কাল্পনিক ভগবান বানিয়ে তার মুখ দিয়ে বলিয়েছে এই কথা।

ব্রাহ্মণরা মনে করল যে, ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি মূলনিবাসীরা বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করে তাহলে তারা তো ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মজ্ঞানের কোনো মূল্যই দেবে না। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়েছিল। ইংরেজরা এখানকার মূলনিবাসীদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে– এ বিষয়টা ব্রাহ্মণরা কিছুতেই হজম করতে পারছিল না।

শিক্ষার অধিকার হরণে ব্রাহ্মণদের কূট-কৌশলের উদাহরণ

বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ তো একটা বড় ঘটনা। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতির জন্য উদাহরণ স্বরূপ একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি, শিক্ষার অগ্রদূত গুরুচাঁদ ঠাকুর বাল্যজীবনে ব্রাহ্মণদের পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি নীচু জাতির বলে। পরে তিনি মুসলমানদের মক্তবে কিছুটা পড়াশুনা করেন। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই অপমান তিনি তখন ভুলে জাননি। পরবর্তীতে তিনি সকলের জন্য শিক্ষার আন্দোলন করেন। তাঁর উদ্যোগে অসংখ্য স্কুল নির্মিত হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার জন্য তৎকালীন কায়স্থ পরিবারের ব্যবসায়ী গিরীশ বসু সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। গিরীশ বসু বলেন–

"এই দেশে চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই।
দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিতে চাই।।"

(গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ১৩৭)

গিরীশ বসুর এই প্রস্তাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন–

"প্রভু বলে 'মহাশয় বড় ভাল কথা।
ব্যাধি-দূর-করা বটে অতি উদারতা।।
অজ্ঞান-ব্যাধিতে ভরা আছে এই দেশ।
জ্ঞানের আলোকে ব্যাধি তুমি কর শেষ।।
উচ্চ বিদ্যালয় এই দেশে কোথা নাই।
উচ্চ বিদ্যালয় কর এই ভিক্ষা চাই।।" (গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ১৩৭)

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথা মতো গিরীশ বসু হাসপাতাল না করে উচ্চ বিদ্যালয় করে দেবার প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু এই কথা তৎকালীন ব্রাহ্মণরা জানতে পেরে তেলে বেগুনে জ্বলতে শুরু করে।

"হিংসুক ব্রাহ্মণ যত ভাবে মনে মন।
উচ্চশিক্ষা পায় যদি নমঃশূদ্রগণ।।
কিছুতে নিস্তার মোরা নাহি পাব আর।
নমঃশূদ্র করিবেক সব অধিকার।।" (গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ১৩৯)

তখন ব্রাহ্মণরা দল বেঁধে গিরীশ বসুকে চেপে ধরে। তারা বলে–

"চিকিৎসালয় দিবে দাও নাহি করি মানা।
স্কুল দিবে কোন মর্মে কিছু ত বুঝি না।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কোথা যেথা তব ঘর।
তুমি বাস কর বাপু! নমঃর ভিতর।।
নমঃ জাতি চিন তুমি বিদ্যা শিক্ষা নাই।
বিদ্যাহীন বলে মোরা তাদেরে চরাই।।
স্কুল যদি পায় তারা বিদ্বান হইবে।
আমাদের মান বাপু কভু না রহিবে।।"(গুরুচাঁদ চরিত- পৃঃ ১৩৯)

এসব কথা শুনে গিরীশ বসু ব্রাহ্মণদের বললেন– "আমি কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। তোমরা আমাকে এই ধরণের কথা আর বল না।" তখন–

"গিরিশের মুখে শুনি এমত কাহিনী
জ্বলিয়া উঠিল সব ব্রাহ্মণ-বাহিনী।।" (গুরুচাঁদ চরিত- পৃঃ ১৪০)

গিরীশ বাবুর কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রতি ক্রোধে জ্বলে ওঠে। বিভিন্নভাবে ধর্মীয় কথা বলে তাঁকে ভয় দিতে লাগল। ধর্ম গ্রন্থের উদাহরণ টেনে বলতে লাগল–

"শূদ্র পক্ষে তপ জপ ত্রেতাযুগে নাই।
শূদ্রকের মাথা কাটে রামচন্দ্র তাই।।
নমঃশূদ্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষীণ হয়ে রবে।
বিদ্যাশিক্ষা তার পক্ষে কভু না সম্ভবে।।
কৃষিকর্ম্ম করে যারা সেই ভাবে র'বে।
বিদ্যা পেলে কৃষিকর্ম্ম বল কে করিবে?"(গুরুচাঁদ চরিত-পৃঃ ১৪১)

শূদ্রদের কোনো তপস্যা করার অধিকার নেই বলেই তো রামচন্দ্র শম্বুকের মাথা কেটে ফেলেছিল। নমঃদেরও নীচ হয়ে থাকতে হবে। তাদেরকে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করার কোনো অধিকার দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া তারা তো চাষাবাদ করে। সেটা নিয়েই তারা থাকুক না। তারা লেখাপড়া শিখলে তখন চাষবাস কারা করবে?

আমরা ব্রাহ্মণরা, আর আমাদের মত উচ্চবর্ণীয়রা তো এদের কাঁধে ভর দিয়ে চলি। অর্থাৎ তারা ফসল ফলায় আর আমরা ভোগ করি। তা ছাড়া ওরা তো–

"লেখাপড়া নাহি জানে বোকা অতিশয়।
শিক্ষিত হ'লে এরা মোদের হবে দায়।।"(গুরুচাঁদ চরিত, পৃঃ ১৪১)

কোনো ভাবেই ব্রাহ্মণরা গিরীশ বসুকে রাজি করাতে না পেরে আবার কয়েক দিন পরে এক সঙ্গে বসে এই ধর্মসংকটের সমাধান করার জন্য যুক্তি করে উপায়

বের করে। তারা দশ-বার জন মিলে কলকাতায় গিরীশ বসুর কাছে যায় এবং তাঁকে পরামর্শ দেয় এই বলে–

"শিক্ষা নিবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণ যত।
তারা যাতে শিক্ষা পায়, কর সেই মত।।
যেই-কর্ম্ম যেবা জানে তারে তাই দাও।
কৃষক লাঙ্গল পাবে মাঝি পাবে নাও।।
নমঃশূদ্র-ভরা দেখি ঘৃতকান্দি গাঁও।
উলুবনে কেন বাপু মুক্তা ছড়াও?"(গুরুচাঁদ চরিত- পৃঃ ১৪২)

এইভাবে ব্রাহ্মণরা গিরীশ বসুকে বুঝিয়ে, সেইসঙ্গে তাঁর ব্যবসার ক্ষতির ধমকি দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে স্কুল করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করায়। আর যেখানে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সেখানে স্কুল করিয়ে নেয়। এই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের ভাবনা। তারা কিছুতেই মূলনিবাসীদের শিক্ষার অধিকার দিতে রাজি নয়। যার জন্য তারা ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন করে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে শুধু সালের নাম দেওয়ার পিছনের কারণ কী

তারা ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার তাতীয়া টোপী নামক ব্রাহ্মণকে আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে। তাতীয়া টোপী প্রথমে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সমস্ত ব্রাহ্মণকে একত্রিত করে। সমস্ত ব্রাহ্মণদের নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলনকেই ব্রাহ্মণরা ১৮৫৭ সালের আন্দোলন নাম দিয়েছিল। আর এই আন্দোলন তাতীয়া টোপী নিজের হাতে না রেখে বাবরের শেষ বংশধর বাহাদুরশাহ জাফরের উপর দায়িত্ব দেয়।

বাহাদুরশাহের কাছে নেতৃত্ব দেওয়ার পিছনে ব্রাহ্মণদের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল।

(১) যদি বাহাদুরশাহ জাফর বিজয়ী হয়, তাহলে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা মোঘলদের শাসন প্রশাসনে প্রথম থেকে যেরকম অংশীদার ছিল, তার থেকে অধিক পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

(২) আর যদি বাহাদুরশাহ পরাজিত হয় তাহলে ইংরেজরা তাকে ফাঁসি দেবে।

আর এরকমই হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহকে ইংরেজরা দমন করেছিল। আর অবশেষে রেঙ্গুনে বাহাদুরশাহ জাফরকে আটক করে তাকে ফাঁসি দেয়। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা যেমন ছিল তেমনি থাকে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। একেই বলে অতিথির লাঠি দিয়ে সাপ মারা। ১৮৫৭ সালের আন্দোলন এটা ভারতে একমাত্র আন্দোলন, যে আন্দোলনে কোনো ব্যক্তির অর্থাৎ আন্দোলনকারীর নাম না

দিয়ে শুধু **'কাল বা সময়'**-এর নাম দেওয়া হয়েছে। ১৮৫৭ সালের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে 'বাহাদুরশাহ জাফরের আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম হলে তাতীয়া টোপী ও রাণী লক্ষ্মীবাই-এর গুরুত্ব কমে যেত। সেজন্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে বাহাদুরশাহের নাম না দিয়ে শুধু সালের নাম দিয়েছে।

মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের আসল রহস্য কী ছিল

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ব্রাহ্মণদের এই শয়তানী চাল বুঝতে পেরে এই বিদ্রোহকে তিনি **'ভট্-পাণ্ডের আন্দোলন'** অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহ বলেছেন। তিনি এই আন্দোলনকে কেন এরকম নাম দিয়েছিলেন? ভট্ হচ্ছে মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্যক্তি। এই মঙ্গল পাণ্ডে নামক ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ ইংরেজদের সেনা বিভাগে চাকরি করত। এর অর্থ মঙ্গল পাণ্ডে ইংরেজদের গোলামি করত। ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল। ভারতমাতাকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এই পাণ্ডে কোনো প্রকার স্বাধীনতার আন্দোলন করেছে বলে কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ কেন করেছিল?

ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা এরকম প্রচার করা হয় যে ইংরেজদের সেনা বাহিনীতে হিন্দু আর মুসলমান সেনা ছিল। এই সেনাদের যে বন্দুক দেওয়া হয়েছিল তার গুলি (কার্তুস)তে গরু আর শুয়োরের চর্বি লাগানো হত। অনেক বছর সেনাবাহিনীতে চাকরী করার পর এই বিষয়টি মঙ্গল পাণ্ডের মাথায় আসে। তারপর মঙ্গল পাণ্ডে এই ব্যাপারটার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরকমটাই প্রচার করা হয়েছে। কারণ হিন্দুদের জন্য গরু পবিত্র। আর মুসলমানদের জন্য শুয়োর অপবিত্র মনে করা হয়। এর অর্থ মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্রাহ্মণের ধর্ম সংকটাপন্ন হয়েছে। সেজন্য সে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু ভারতমাতাকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহ করেনি। ভারতমাতা পরাধীনতার কবলে আছে এই চিন্তা যদি করত তাহলে তো মঙ্গল পাণ্ডের ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসাবে চাকরি করার কথা ভাবাই উচিত ছিল না। এর অর্থ দেশ সংকটে আছে তার জন্য নয়; ধর্ম সংকটে পড়েছে তাই বিদ্রোহ করেছে। জাতিব্যবস্থা ডুবে যেতে পারে। জাতিব্যবস্থা ডুবে গেলে ভেদাভেদ, বিষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এরকমটা যদি হয়, তাহলে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের কী হবে? তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কি হবে? অর্থাৎ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ করেছিল। এটাই হচ্ছে এই ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

হিন্দুদের জন্য গোরু পবিত্র। তার জন্য মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্রাহ্মণ যদি বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে–

(১) ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে ব্রাহ্মণেতর জাতির লোক কি ছিল না? যদি

থেকে থাকে তারা কেন বিদ্রোহ করেনি? বা তাদের কারো নাম এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত নয়?

(২) মুসলমান সেনাদের কার্তুজেও শুয়োরের চর্বি লাগানো থাকত; শুয়োর তাদের জন্য অপবিত্র। তাহলে একজনও মুসলমান সেনা কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি?

তাহলে কি ঘটনা এক আর প্রচার করা হয়েছে অন্য? আসুন সেই বিশ্লেষণে প্রবেশ করা যাক।

প্রকৃতপক্ষে কার্তুজে লাগানোর জন্য চর্বি সাপ্লাই এর কাজ বাঙালি ব্রাহ্মণরাই করত। এই ইতিহাস প্রমাণিত সত্য। এর অর্থ প্লান মাফিক রণনীতি তৈরি করে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা এই কাজ করেছে। এই ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলের জানা ছিল। সে জন্যই তিনি 'ভট্-পাণ্ডের আন্দোলন' আখ্যা দিয়েছিলেন। এটা শুধুমাত্র ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহ ছিল।

কংগ্রেস পার্টি স্থাপনের পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল

১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহকে ইংরেজরা শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের সামনে একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা মনে করল এখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কীভাবে আন্দোলন করা যাবে? এর জন্য ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যেমন বাহাদুরশাহকে সামনে রেখে করেছিল তেমনিভাবে চালাকি করে ১৮৮৫ সালে এলান অক্টোভিয়ান হিউম নামক খ্রিস্টান ব্যক্তিকে সামনে রেখে কংগ্রেস এর স্থাপন করে। হিউম ছিলেন একজন অবসর প্রাপ্ত ICS. প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের স্থাপক লাল-বাল-পাল।

লাল– লালা লাজপত রায়– পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়।

বাল– বাল গঙ্গাধর তিলক– মহারাষ্ট্রের কোব্রা ব্রাহ্মণ।

পাল– বিপিনচন্দ্র পাল। সিলেটের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জমিদার।

এই তিনজন মিলিত হয়ে কংগ্রেসের স্থাপনা করেছিল। আর এই তিনজনের মধ্যে মুখ্যত IPC -Indian Penal Code-এর ভয়ে করেছিল।

কংগ্রেস পার্টি স্থাপনের পিছনে মুখ্যত দুটি কারণ ছিল–

(১) ইংরেজদের আইনের ভয়। যে আইনে ব্রাহ্মণকেও ফাঁসি দেওয়া যেত।

(২) রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলে কর্তৃক ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ সালে যে 'সত্যশোধক' সমাজের স্থাপন হয়েছিল সেটাকে নির্মূল করার জন্য।

প্রমাণ– ১৯৩৬ সালে মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার ফৈজাপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 'সত্যশোধক সমাজ' কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক কথায় সত্যশোধক সমাজকে গলাধকরণ করার জন্যই কংগ্রেসের স্থাপন করা হয়েছিল।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে কংগ্রেসকে ব্রাহ্মণসভা হিসাবে মনে করতেন। কংগ্রেস অর্থাৎ ব্রাহ্মণসভা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের সুবিধার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। ঐ সময় ব্রাহ্মণেতর লোকেরা সত্যশোধক সমাজের হয়ে কাজ করত। এই ব্রাহ্মণেতর লোকদের নেতৃত্ব করার জন্যও কংগ্রেসের স্থাপন করা হয়। এর প্রমাণ হিসাবে কেশবরাও জেধে-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাবাসাহেবের খুব ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলে ও শাহু মহারাজের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছিলেন। তিনি যখন কংগ্রেসে যোগদান করেন তখন বোম্বের কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৮ জন। বাবাসাহেবকে শুধু পরাস্ত করতেই নয়, তাঁকে শেষ করার জন্য কেশবরাও জেধেকে বোম্বের কংগ্রেসের প্রদেশ অধ্যক্ষ করে। এর ফলে বহুজন সমাজের লোকেরা কংগ্রেসে সামিল হয়। জলগাঁও-এর ফৈজাপুরে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখনও তিনি প্রদেশ অধ্যক্ষ ছিলেন। আর ঐ সময় এক বছরের মধ্যে বোম্বের কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১২৬১৯ জন। এসব কেশবরাও জেধের জন্যই হয়।

পরপবর্তীতে কংগ্রেসের শয়তানি বুঝতে পেরে কেশবরাও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। কংগ্রেস ছাড়ার সময় তিনি একাই বেরিয়ে আসেন। বাকি লোক কংগ্রেসেই থেকে যায়।

কংগ্রেস প্রচার করে যে স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের গঠন করা হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এর প্রমাণ হচ্ছে যে, ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা একজন খ্রিস্টান ব্যক্তিকে সামনে রেখে (এ ও হিউম) ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গঠন করে। কংগ্রেস পার্টিতে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তাব ১৯২৯ সালে পাশ করে। কংগ্রেসের গঠন যদি স্বাধীনতার জন্য করে থাকে তাহলে ৪৪ বছর পরে কেন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করল? এর অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের গঠন হয়নি। এছাড়া সত্যশোধক সমাজের গঠন ও তার অগ্রগতি কংগ্রেসিদের (ব্রাহ্মণদের) চোখে কাঁটার মত বিঁধে ছিল। কিন্তু তারা সরাসরি এর বিরোধিতা করতে পারছিল না। পরবর্তীতে এই সূত্র ধরে বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী জন্ম জয়ন্তী পালন বন্ধ করার জন্য গনেশ উৎসব শুরু করেন। তিনি যদি শিবাজী জন্ম জয়ন্তী পালন করতে মানা করতেন, তাহলে কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করত না। তাই তিনি কৌশল করে গনেশ উৎসবের সূচনা করেন। আর ধীরে ধীরে শিবাজী জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালন বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই গনেশ উৎসব কিন্তু শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই হয়। বাংলার দুর্গোৎসবের মত। এইভাবে তিলক মহামনীষীর উৎসবকে ধীরে ধীরে ভগবানের রাস্তায় নিয়ে আসেন। মূলনিবাসী বহুজন সমাজের জাগরণকে শেষ করাই এ সবের পিছনের কারণ ছিল। আর সেটার প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে এই ব্রাহ্মণরা। কারণ শিবাজী মহারাজের জন্ম জয়ন্তী আগে দশ

দিন ধরে উৎযাপন করা হত। শিবাজীর জন্ম জয়ন্তীকে তারিখ ও তিথির বিবাদ খাড়া করে তাকে দূর্বল করে দিয়েছে। যেটুকু শিবাজীর জন্ম জয়ন্তী পালিত হয় সেটাকে ব্রাহ্মণ্যকরণ করেই তাঁকে ভগবান ও মুসলিম বিদ্বেষী বানিয়ে পালন করা হয়।

কংগ্রেসের গঠন যেমন একজন খ্রিস্টান ব্যক্তির নামে করেছে, তেমনি কংগ্রেকে অর্থ সহায়তা করতেন দাদাভাই নৌরোজী। যিনি একজন পারসি ছিলেন। কংগ্রেসকে ছয় লাখ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজ করেন একজন গুজরাটি বানিয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। আর কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করেছেন একজন গুজরাটি শূদ্র সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেসের থেকে লাভ হয়েছে একজন কাশ্মিরী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণ জবাহরলাল নেহেরুর।

এই ধরণের কংগ্রেস ১৮৮৫ সাল থেকেই ইংরেজদের কাছে একটা দাবি করতে থাকে। সেটা হচ্ছে, ইংরেজরা ভারতেই থাকবে, কিন্তু শাসন প্রশাসনে ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

ইতিপূর্বে যেমন মোঘলরাও ব্রাহ্মণদের প্রশাসনে ভাগীদারী দিত। যদি এরকম হয় তাহলে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। আর এরকম হলে ইংরেজদের রাজা ব্রাহ্মণদেরও রাজা হবে। ইংরেজদের সম্রাট ব্রাহ্মণদেরও সম্রাট হবে। ইংরেজদের বাদশাহ ব্রাহ্মণদেরও বাদশাহ হবে। এক কথায় ইংরেজরা শাসন প্রশাসনে ব্রাহ্মণদের ভাগীদার করলে তাদের এদেশ থেকে চলে যেতে হবে না। একেই এই ব্রাহ্মণরা বলে স্বরাজ বা হোমরুল।

ব্রাহ্মণদের স্বরাজের অর্থ কী

তিলক মহারাষ্ট্রের আকোলা, ইভাতমাল ও ভুষাওয়ালের খোলা ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণ 'কেশরী' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়। তিলক বলেন **"আমাদের স্বরাজের অর্থ এটা নয় যে, ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। ইংরেজরা চাইলে ভারতে থাকতে পারবে। কিন্তু শাসন প্রসাশনে আমাদের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।"** এর জন্য তিলক মনুস্মৃতির উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, "মনুস্মৃতি অনুসারে যে কোনো রাজা তার শাসনকার্য চালাতে চাইলে বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে নিয়ে শাসন প্রশাসন চালানো উচিত।" বুদ্ধিমান অর্থাৎ লেখাপড়া শেখা পণ্ডিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এর অর্থ তিলকের আন্দোলন শুধুমাত্র ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদেরকে ইংরেজদের শাসন প্রশাসনে প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার আন্দোলন ছিল। যাকে স্বরাজ বা হোমরুল আন্দোলন বলা হয়। এটা কোনো প্রকারে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ছিল না। যদিও এটাকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলেই প্রচার করা হয়। স্বরাজ এবং স্বাধীনতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সেটা সঠিকভাবে বোঝা দরকার। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের স্থাপনা ইংরেজদের কাছে প্রতিনিধিত্বের

দাবির জন্যও করা হয়েছিল। আর এই প্রতিনিধিত্বের দাবির বিষয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য ১৯১৮ সালে সাউথবরো কমিটি ভারতে আসে। অর্থাৎ প্রায় ৩৩ বছর পরে ইংরেজরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এই কমিটির মাধ্যমে আইন পরিষদের গঠন করে।

১৯১৮ সালে ইংরেজদের দ্বারা আইন পরিষদ গঠন করাকে বাবাসাহেব আম্বেদকর তিনভাগে ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) বিগত ২৫০০ বছরের ভারতে সবথেকে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা।

(২) সম্রাট অশোকের পর ভারতে সব থেকে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা।

(৩) Sparking light– স্ফুলিঙ্গ।

এই ঘটনার ফলে বিগত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৮ সালের আগে ভারতে প্রজাদের জন্য আইন বানানোর অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল– যাকে ব্রাহ্মণ পিনাল কোড বা মনুস্মৃতি বলা হয়। এর সামনে সব কিছু ছিল অসমান। শুধু ব্রাহ্মণরাই সবার উপরে বাকি সবাই তাদের নীচে। আর ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড চালু হয়। এর হিসাবে সকলে সমান। কোনো উঁচু নীচু নেই। এর ফলে বিদেশী ব্রাহ্মণদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলতে থাকে। আর ব্রাহ্মণরাই ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য আন্দোলন শুরু করে। বাবাসাহেব এই ঘটনার বিষয়ে যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আইন পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে আইন তৈরি করার প্রক্রিয়ায় অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব খুব গুরুত্বপুর্ণ হয়ে পড়ে। নেংটি পরার লোকেরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমমর্যাদায় কাজ করার অধিকার অর্জন করে। আমাদের লোকদের জন্য কি আইন হওয়া দরকার বা কোন আইন বন্ধ হওয়া দরকার বা আইন কীভাবে তৈরি করতে হবে সেসব কিছু নির্ধারিত করার অধিকার অস্পৃশ্যরা পেতে চলেছিল। ফলে ব্রাহ্মণরা তেলে বেগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিল। সে জন্য ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীতার আন্দোলন শুরু করেছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে তিনটি বিশেষ কারণ ছিল।

(১) ১৭৭৪ সালে কোম্পানী আইন অনুসারে নন্দকুমার দেব নামক ব্রাহ্মণকে ইংরেজরা ফাঁসি দেয়।

(২) ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে।

(৩) ১৯১৮ সালে ইংরেজরা আইন পরিষদ গঠন করে।

১৮৮৫ সালে স্থাপিত কংগ্রেস দ্বারা ব্রাহ্মণরা ইংরেজদের কাছে প্রতিনিধিত্বের দাবি করে। এই দাবির বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য ১৯১৮ সালে সাউথবরো কমিটি ভারতে আসে। কংগ্রেসের মতো আরও তিনজন প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন।

১। ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর, অস্পৃশ্য।

২। ভাস্কররাও যাদব, মারাঠী কুনবি, ওবিসি।

৩। মহম্মদ আলী জিন্না, মুসলিম। তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন।

কংগ্রেস যদি সকলের জন্য প্রতিনিধিত্বের দাবি করত বা করে থাকে, তাহলে এই তিনজন আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্বের দাবি কেন করেছিলেন? আর এই তিনজন ব্যক্তি নিশ্চয় মূর্খ ছিলেন না। তাহলে এটা বলা যায় যে এই তিনজন কংগ্রেসকে একটুও বিশ্বাস করতেন না। ভাস্কররাও যাদব মারাঠা জাতির কুনবি (বাংলায় কুর্মি) ছিলেন। অর্থাৎ ওবিসি ছিলেন। তাই ওবিসিদের জন্য প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। তিনি কংগ্রেসকে কখনও বিশ্বাস করেননি। একথা ভাস্কররাও যাদবের বংশজদের অর্থাৎ ওবিসিদের বোঝা উচিত। ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের (বর্তমানে তপশিলি জাতি) জন্য প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছিলেন। কারণ তিনি অস্পৃশ্য ছিলেন। তিনিও কংগ্রেসকে কখনও বিশ্বাস করেননি। তিনি কংগ্রেসকে বলেছেন জ্বলন্ত আগুনের ঘর। এসব কথা বাবাসেহেবের বাচ্চাদের অর্থাৎ বাবাসাহেবকে যাঁরা মানেন তাদের বোঝা উচিত। মহম্মদ আলী জিন্না মুসলমান ছিলেন। তাই তিনি মুসলমান ভাইদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছিলেন। কারণ তিনিও কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতেন না। একথা তাঁকে মান্য করা লোকদের বোঝা উচিত।

এই তিনজন যেখানে কংগ্রেসকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতেন না, সেখানে এঁদের বালকরা আজ কংগ্রেসের চালক হয়ে কাজ করছে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করছে। এটা একটা গভীর সমস্যা। এর জন্যই সঠিক ইতিহাস জানা বা বোঝা দরকার। **ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিতে ভুল করবে না।**

ভাস্কররাও যাদবের দাবিকে বাল গঙ্গাধর তিলক গালাগালি দিয়ে বিরোধিতা করেন। ভাস্কররাও যাদবের পিছনে শাহু মহারাজ ছিলেন একথা তিলক জানতেন। সেজন্য তিনি শাহু মহারাজের রাজ্যের সীমানার বাইরে গিয়ে ভাস্কররাও যাদবের প্রতিনিধিত্বের দাবির বিরোধিতা করে গালাগালি দেন। তিলক তাঁর ভাষণে বলেন, **"তেলি, তাম্বোলী আর কুনবটরা (কুর্মি) সংসদের গিয়ে কি হাল চালাবে?"** তেলি একটা জাতি, তাম্বোলীও একটা জাতি আর কুনবিও একটা জাতি। 'কুনবি'-এর জায়গায় 'কুনবট' বলা এটা গালাগালি। আর এ গালি তিলক সমস্ত মারাঠা কুনবিদের দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই কুনবিরাই তিলককে লোকমান্য হিসাবে মান্য করেন, তাঁকে সম্মান করেন। বাস্তবে তিলককে তো লোকমান্য না বলে ভট্‌মান্য (ভট্‌ মানে ব্রাহ্মণ) বলা দরকার। তিলক তেলি, তাম্বোলী ও কুনবিদের সংসদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিতে চাইতেন না। কিন্তু প্রচার মাধ্যম তিলককে তেলি, তাম্বোলী আর কুনবিদের নেতা বলে প্রচার করে। বাস্তবে এই প্রচার মাধ্যমকে ব্রাহ্মণ বাণিয়া প্রচার মাধ্যম বলা দরকার।

কিছু ওবিসি বান্ধব ভাবতে পারেন, তিলক তো শুধুমাত্র তিনটি জাতির নাম করেই তাদের গালি দিয়েছেন। তাদের জাতির নাম তো নেননি। ওবিসিরা তো ৩৭৪৩টি জাতির। তাই সলকের নাম নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? ওবিসিদের বাকি জাতির লোকদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই অল্প সন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নয়।

অস্পৃশ্যরাও এরকম ভাবতে পারেন যে, তিলক তাদের নাম নেননি। আরে ভাই, অস্পৃশ্যদের নাম নেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি? অস্পৃশ্যদের নাম নিলে তো এই পেশোয়া ব্রাহ্মণের জিহ্বাই হয়তো অস্পৃশ্য হয়ে যেত। তাই ঘৃণার জন্যই এদের নাম নেননি। অস্পৃশ্যদেরও খুশি হওয়া বা অল্প সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এককথায় বলা যায় যে, তিলক ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে বাকি সব অব্রাহ্মণদের যে কোনো জাতির লোককে আইন পরিষদের যেতে দিতে রাজী ছিলেন না। এর জন্য ব্রাহ্মণরা তিলকের প্রতি খুব গর্ববোধ করত। কিন্তু এই গর্ববোধ অব্রাহ্মণদের হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? ব্রাহ্মণরা অবশ্যই তিলকের জন্ম ও মৃত্যুদিন পালন করতে পারে। তার জন্য অব্রাহ্মণরা কেন করবে বলুন তো?

এই তিলকের একটি বাক্য আমাদের অবশ্য পাঠ্য পুস্তকে পড়ানো হয়। সেটা হচ্ছে- **“স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার। একে আমি অর্জন করবই।”** আমাদের বাচ্চারা এই বাক্যটি অবশ্য তোতাপাখির মত বলে। কিন্তু এর সঙ্গে এটাও পড়ানো দরকার যেটা তিলক বলেছেন। সেটা হচ্ছে- **“তেলি, তাম্বলী আর কুনবটরা সংসদে গিয়ে কি হাল চালাবে?”** এটা কেন পড়ানো হয় না? এটাও তো তিলকের বাণী। আসলে তিলক চান সংসদে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই প্রবেশাধিকার আছে। বাকি লোকদের তো ব্রাহ্মণরা জাতিগত কাজ নির্ধারিত করে দিয়েছে। তাদের সেই কাজই করা দরকার। এই হচ্ছে মহান লোকমান্য তিলক!

তিলক যখন মূলনিবাসীদের সংসদে যাওয়ার বিরোধিতা করছিলেন এবং গালি দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ গাড়ুগেবাবা (রাস্ট্রীয় সন্ত) তাঁর ভাষণ শুনছিলেন। তিলক তখন গাড়ুগেবাবাকে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে কিছু বলতে বলেন। গাড়ুগেবাবা বলেন, “আমি তো জাতিতে ‘ধোপা’ আমি কী আর বলব। তিলক মহারাজ, তুমি আমাকে বামুন (ব্রাহ্মণ) বানিয়ে দাও। কারণ আমি সংসদের যেতে চাই।”

গাড়ুগেবাবা তিলকের গালির জবাবে এটা বলে তাঁকে উপযুক্ত জবাব দেন। কারণ, ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিলে তো তাঁকে আর কেউ গালি দিতে পারবে না।

ভারতে অব্রাহ্মণ লোকেরা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। শিখ ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। বৌদ্ধ ধম্ম গ্রহণ করতে পারে। খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করতে পারে। এরকম হয়েছে বা হয় বা হচ্ছে। কিন্তু ভারতের অব্রাহ্মণ কোনো একজন ব্যক্তিও কি

ব্রাহ্মণ হতে পারে? হয়েছে কি? এরকম কোনো প্রমাণ আছে কি? কেউ এর প্রমাণ দিতে পারবেন কি?

এতক্ষণ জানা গেল ব্রাহ্মণরা কেন পাঠান বা মোঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করেনি। আর কেনইবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। এবার আমরা দেখবো–

মূলনিবাসী মহামানবেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে কেন যোগদান করেননি

প্রথম থেকেই ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের একটা সমস্যা চলছে। সেটা হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে তারা অতি অল্পসংখ্যক। আর মূলনিবাসী সমাজের সুবিধা হচ্ছে তারা সংখ্যায় অধিক। মূলনিবাসী সমাজের কাছে এই সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হলে তো স্বল্পসংখ্যক লোক দিয়ে হবে না। আর সেটা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরা করতে পারবে না। এই কথাটা কিন্তু তারা খুব ভালো করেই জানে। তাই তারা মূলনিবাসী মহামনীষীদেরকে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়।

রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলেজী কেন ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি

সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণরা আমাদের মূলনিবাসী বহুজনদের মহামানব রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলের কাছে যায়। তারা ফুলেজীকে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু ফুলেজী ব্রাহ্মণদের সামনে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ান। সেটা হচ্ছে, প্রথমে ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত হতে হবে না কি ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে। কারণ, তখন ভারতে দুপ্রকারের গোলামি ছিল।

(১) ইংরেজদের দ্বারা গোলামিঃ– এই গোলামি ছিল রাজনৈতিক। এটা অনন্তকাল ধরে ছিল না। ইংরেজদের গোলামি শুধুমাত্র ভৌগোলিক গোলামি ছিল।

(২) ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা গোলামিঃ– এই গোলামি ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় গোলামি। অর্থাৎ এটা ছিল মানসিক গোলামি। যে ব্যক্তি মানসিকভাবে গোলাম হয়, প্রকৃতপক্ষে সে গোলামই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মানসিক দৃষ্টিতে স্বাধীন হয়, সেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামির অর্থ হচ্ছে, বর্ণব্যবস্থা, জাতিব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। তখন রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলে উপরোক্ত দুটো গোলামির মধ্যে প্রথমে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন। আর ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামগিরি থেকে মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ফুলেজী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করেননি। তিনি নিজেই মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে ব্রাহ্মণ্য গোলামগিরি থেকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে 'গ্রন্থকার' সভার মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সহযোগী হওয়ার জন্য মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলেকে লিখিত আমন্ত্রণ জানান। ফুলেজীও ১১ জুন ১৮৮৫ সালে চিঠি লিখে ঐ আমন্ত্রণের উত্তর দেন। তিনি লেখেন, **"আমার খালমোড়ে দাদা** (খালমোড়ে অর্থাৎ যেকোনো কাজে সব সময় যে বা-হাত দেয়), **আপনারা উটের পিঠে বসে ছাগল চরানোর লোক। আপনারা আমাদের দেশে বর্ণব্যবস্থা, জাতিব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করে সমাজে অসাম্য তৈরি করেছেন। আপনারা তো আমাদের সঙ্গে কখনও সাম্যের ব্যবহার করবেন না। তাই আমি আপনাদের আন্দোলনে যোগ দিতে পারি না।"**

জ্যোতিরাও ব্রাহ্মণদের কলম-কসাই কেন বলতেন

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। **তিনি ব্রাহ্মণদেরকে 'কলম-কসাই' বলতেন।** কেউ কিছু বলি দিলে তাকে কসাই বা জল্লাদ বলা হয়। **আর কলম কসাই হচ্ছে– ব্রাহ্মণরা শূদ্র, অস্পৃশ্য বা মূলনিবাসীদের কলমের মাধ্যমে বই বা তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ লিখে বলি দিয়েছে।** সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণদের কলম-কসাই বলেছেন।

ফুলেজী ব্রাহ্মণদের মুখের উপর এইভাবে জবাব দিয়ে শূদ্র, অস্পৃশ্য বা মূলনিবাসীদের একটা মৌলিক পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, **"যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতে আছে শূদ্র, অস্পৃশ্য বা মূলনিবাসীদের ততক্ষণ পর্যন্ত সময় আছে বিদেশী ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তাই যত তাড়াতাড়ি পারো শিক্ষিত হও।"**

এখানে কিন্তু ফুলেজী ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেননি। তিনি ব্রাহ্মণদের গোলামী থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার জন্য বলেছেন। আর তার জন্য শিক্ষিত হতে বলেছেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে দুটো স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল। (১) ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামী থেকে মূলনিবাসী বহুজনদের মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন এবং (২) ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিদেশী ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলন।

যখন রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিরাও ফুলে মূলনিবাসী বহুজনদের স্বাধীনতার আন্দোলন

চালাচ্ছিলেন তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জন্মই হয়নি। কারণ ফুলেজী ১৮৪৮ সাল থেকে আন্দোলন শুরু করেন। আর প্রায় ২১ বছর পরে ১৮৬৯ সালে ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্ম হয়। দুঃখের বিষয় মূলনিবাসী বহুজন সমাজ গান্ধিজিকে ভাল করে চেনে বা জানে। কিন্তু ফুলেজীকে একটুও চেনে না। এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে, ব্রাহ্মণ-বানিয়া প্রচার মাধ্যম। প্রচার মাধ্যমই গান্ধিজিকে মহাত্মা বানিয়েছে। গান্ধিজির আসল চরিত্র যেদিন মূলনিবাসী বহুজনরা জানবে, সেদিন তাঁকে নিশ্চয় শরীর থেকে ময়লা ধুয়ে ফেলার মত ঝেড়ে ফেলে দেবে।

ছত্রপতি শাহু মহারাজ কেন ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ব্রাহ্মণদের আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করার পর গোখলে এবং রানাডে ছত্রপতি শাহু মহারাজের কাছে যান। শাহুজীকে লিখিত আবেদন জানান আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। শাহু মহারাজও চিঠি লিখে গোখলে ও রানাডের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেন, **"আমাদের সমাজ ছাগলের মত। আমি তাদেরকে ভেড়ার সঙ্গে কাজ করতে পাঠাতে পারি না। আর আপনারা আমার মতো মহিষকে (শাহুজী পালোয়ান ও শক্তিশালী ছিলেন) যেখানে বিচলিত করছেন, আমাকে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন, সেখানে ছাগলদের নিয়ে কিনা করতে পারেন আপনারা। তাই আমি আপনাদের আন্দোলনে অংশীদার হতে চাই না।"** শাহু মহারাজ ব্রাহ্মণদের চরিত্রের ব্যাপারে খুব ভাল করেই জানতেন। তাই জেনেশুনে তিনি তাঁর সমাজকে বেচে দিতে পারেন না।

পেরিয়ার কেন ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি

এবার দেখি তামিলনাড়ুর ই ভি পেরিয়ার রামাস্বামীকে। তিনি ওবিসি সমাজের ছিলেন। তিনি ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস প্রেসিডেন্সির সেক্রেটারি ছিলেন। গান্ধিজি তাঁর উপর ছাত্রাবাস দেখার দায়িত্ব দেন। তিনি ছাত্রাবাস পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য ব্রাহ্মণ রাধুনী। আর অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য অব্রাহ্মণ রাধুনীর ব্যবস্থা আছে একই ছাত্রাবাসে। ব্যাপারটা পেরিয়ারজীর ভাল লাগেনি। তিনি এ বিষয় সম্পর্কে গান্ধিজিকে জানান। তিনি গান্ধিজিকে বলেন, **"আমি সরকারের অর্থ খরচ করে এই জাতিবাদীতাকে পুষতে চাই না।" তখন গান্ধিজি তাঁকে বলেন, "এটা আপনার ব্যক্তিগত অফিস নয়। এসব নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোনো দরকার নেই।"** এর অর্থ গান্ধিজি জাতিবাদকে বন্ধ না করে তাকে ফুলেফলে পূর্ণ করতে চান। অন্যদিকে পেরিয়ারের আন্দোলন ছিল জাতিবাদ নষ্ট করার জন্য। পেরিয়ার গান্ধিজির উত্তর শুনে সেক্রেটারির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। আর এটাও

গান্ধিজিকে জানিয়ে দেন যে, এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে ভারতে ডেমোক্রাসি নয় ব্রাহ্মণক্রাসি আসবে। পরবর্তীতে একথাই প্রমাণিত হয়। ১৯৫১ সালের লোকসভার নির্বাচনে নেহেরু ৩.৫% ব্রাহ্মণকে ৬০% টিকিট দিয়ে ৫৬% ব্রাহ্মণকে বিজয়ী করে আনেন। এর ফলে দেশের জনগণের জন্য সংসদে আইন বানানোর একছত্র অধিকার ব্রাহ্মণদের হাতে এসে যায়। শুধু এটাই নয় গণতন্ত্রের চার পিলার–সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও প্রচার মাধ্যম ব্রাহ্মণদের কব্জা হয়ে যায়। ভারতের গণতন্ত্র ব্রাহ্মণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৯১৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করার পর পেরিয়ার রামাস্বামী একটা বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ওবিসি সমাজকে জাগরিত করার কাজ শুরু করেন। মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে জাগরিত করার জন্য তিনি গলায় ঢোল বেঁধে তার দুপাশে দেবদেবীর ফটো লাগাতেন। আর সেই ফটোতে জুতা চপ্পল মারতেন। মূলনিবাসী সমাজকে জাগরিত করার জন্য তিনি এটা করে দেখাতেন যে, এই দেবদেবীর কোনো ক্ষমতা নেই। আসলে **মূলনিবাসী সমাজের উপর দেবদেবীর খুব প্রভাব রয়েছে। বিদেশী ব্রাহ্মণরা মন ও মস্তিষ্কের উপর দেব-দেবতার ভয়কে চেপে রেখেছে। এটা হচ্ছে আসল আতঙ্কবাদ। বিদেশী ব্রাহ্মণরা জেনেবুঝে ও অনেক প্লানিং করে এই ভয় সৃষ্টি করেছে। দেব-দেবতার আতঙ্কবাদ এটা যে কোনো প্রভাবশালী আতঙ্কবাদীর চেয়েও হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর।** যদি দেব-দেবতাকে না মানে তাকে পূজা না করে মানত পূর্ণ না করে ধুপ আগরবাতি না জ্বালায়, যদি দেবতার মন্দিরে কপালে না ঠেকায় ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে দেব-দেবতা রুষ্ট হয়ে যাবে। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা মিথ্যা কথা বলে মূলনিবাসীদের মগজ ধোলাই করছে। আর সাধারণ জনগণ এটা বুঝতে না পেরে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। এটাই প্রত্যক্ষ আতঙ্কবাদ। এই আতঙ্কবাদকে লোকের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্য পেরিয়ার দেব দেবতাকে জুতো পেটা করতেন। এভাবে জাগরণের কাজ করেছিলেন।

তিনি জনতাকে বলতেন, যদি সাপ আর ব্রাহ্মণকে এক সঙ্গে দেখো, তাহলে কাকে প্রথমে মারবে? লোকে বলত প্রথমে সাপকে মারবে। তখন পেরিয়ারজী বলতেন, সাপকে কখনও মারবে না। লোকে কারণ জানতে চাইলে তিনি বলতেন সাপকে ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণকে মারা দরকার। কারণ, সাপ কাউকে কাটলে মারা গেলে সে একাই মারা যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছোবল মারলে বংশের পর বংশ নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি শত্রু ও মিত্রের সঠিক পরিচয় জনগণের সামনে তুলে ধরে ছিলেন। ফলে একজন ব্রাহ্মণও তখন ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেনি। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণকন্যা জয়ললীতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে পেরিয়ারের আন্দোলন ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছিল না। বিদেশী ব্রাহ্মণদের গোলামি থেক মুক্ত হওয়ার জন্য ছিল।

বাবাসাহেব কেন ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি

এবার আমরা দেখি বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের আন্দোলন। বাবাসাহেব আমেরিকায় শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে লালা লাজপত রায় গিয়ে বাবাসাহেবকে বলেন, "আপনি অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপনার মধ্যে সমাজের জন্য কাজ করার চেতনা আছে। তাই আপনি কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহন করুন।" বাবাসাহেব তাঁকে বলেন, "আমি এখানে পড়াশুনা করার জন্য এসেছি। আমাকে প্রথমে শিক্ষা গ্রহণ করতে দিন। ভারতে গিয়ে পরে আমি এসব দেখবো।" **পরবর্তিতে বাবাসাহেব ভারতে এসে 'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকায় নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে লেখেন, "পরতন্ত্রে (পরের অধীন) যাদের কথা আমরা সহ্য করতে পারছি না, স্বাধীনতার পরে আমাদেরকে তাদের লাথি খেতে হবে।"** পরতন্ত্র অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনকালে আমরা যাদের কথা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কথা এখনই সহ্য করতে পারছি না। আর এই ব্রাহ্মণরা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তো তারা আমাদের লাথি মারবে। বাবাসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আমাদের সমাজের লোকদেরকে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে টিকিট চাইতে হয়। টিকিট যদিও পাওয়া যায় নির্বাচিত হয়ে আসার জন্যও তাদের সাহায্য নিতে হয়।

লালা লাজপত রায় ও কংগ্রেস ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন। বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন।

১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে বাবাসাহেব মূলনিবাসীদের জন্য চারটি মৌলিক অধিকার অর্জন করেছিলেন।

১। পৃথক নির্বাচনের অধিকার (Separate Electorates)

২। দুটি ভোটের অধিকার (Duel Voting)

৩। পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Adequate Representation)

৪। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার (Adult Franchise)

এই মৌলিক অধিকারগুলোর বিরুদ্ধে গান্ধিজি তীব্র বিরোধ করেন। শুধু বিরোধ নয় অস্পৃশ্য, আদিবাসী ও ওবিসি-রা যাতে এই অধিকার ভোগ করতে না পারেন তার জন্য তিনি পুনার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন করেন। গান্ধিজি তাঁর জীবনে মোট ২১ বার অনশন করেছেন। প্রত্যেকবার তিনি অস্পৃশ্য, আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বিরুদ্ধে এই উপবাস করেন। দেশ স্বাধীন হওয়া দরকার, তার জন্য তিনি এক মিনিটও উপবাস করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু মূলনিবাসীদের যাতে কোনো প্রকার অধিকার বা স্বাধীনতা অর্জিত না

হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে ইংরেজদের বলেন, **"যদি ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীন করে দেয় আর সেই স্বাধীনতা অস্পৃশ্যরাও লাভ করে তাহলে এরকম স্বাধীনতা আমি চাই না।"** বাস্তবে তিনি কখনও অস্পৃশ্যদের কোনোপ্রকার স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিলেন না। অর্থাৎ গান্ধিজির স্বাধীনতার আন্দোলন সকলের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল না। এসব আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম **তিলক ওবিসিদের আইন সভায় যেতে না দেওয়ার জন্য গালি দিচ্ছেন। গান্ধিজি অস্পৃশ্যদের স্বাধীনতায় রাজি নন। তাহলে এটা প্রমাণ হয় যে, তিলক, গান্ধিজি, গোখলে, রানাডে এবং এদের কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন সকলের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল না। তাঁরা শুধুমাত্র ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। আর সেটাকে সকলের স্বাধীনতার আন্দোলন বলে প্রচার করেছেন।** মূলনিবাসী মহামানবরা ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে আন্দোলন ১৮৪৮ সালে শুরু করেছিলেন, সে আন্দোলন এখনও চলছে। মূলনিবাসীরা এখনও স্বাধীন হননি। তাঁরা এখনও ব্রাহ্মণদের গোলাম হয়ে আছেন।

বাবাসাহেবের কথায় আবার ফিরে আসি–

বাবাসাহেব আম্বেদকর ইংরেজদেরকে একটা প্রশ্ন করেন। সেটা হচ্ছে- **আপনারা ভারতকে যে স্বাধীনতা দিতে যাচ্ছেন সেটা দেশের স্বাধীনতা নাকি দেশের জনগণের স্বাধীনতা? দেশের স্বাধীনতা হচ্ছে Freedom of the country আর দেশের জনগণের স্বাধীনতা হচ্ছে Freedom of the people of the country. এর পরেও ইংরেজরা দেশকেই স্বাধীন করেছে। দেশের জনগণকে স্বাধীন করতে দেননি গান্ধিজি আর কংগ্রেস।**

বাবাসাহেব যে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি তার প্রমাণ খোদ পাঞ্জাবী গোরা ব্রাহ্মণ অরুণ শৌরি তাঁর বই Worshipping False Gods. অর্থাৎ 'মিথ্যা দেবতার পূজা' নামক বইতে জানিয়েছেন।

এই বই-এ তিনি লিখেছেন, ড. আম্বেদকর স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু নিজেকে আম্বেদকরবাদী বলে প্রচার করা আম্বেদকরের ভক্তরা বই লিখে জানিয়েছেন যে বাবাসাহেব স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাস্তবে অরুণ শৌরি এবং আম্বেদকরবাদীরা দুজনেই মিথ্যা কথা প্রচার করেছেন।

অরুণ শৌরি লিখেছেন ড. আম্বেদকর স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেননি। আসলে তাঁর লেখা দরকার ছিল, ড. আম্বেদকর ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেননি। আর যে আম্বেদকরবাদীরা লিখেছেন, বাবাসাহেব স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটাও মিথ্যা কথা। একই ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী দুটো আন্দোলনে কীভাবে যোগদান করতে পারেন? বাবাসাহেব নিজে মূলনিবাসী

বহুজনদের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তাই তিনি ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে অরুণ শৌরি বাবাসাহেবের বিরুদ্ধে কেন একথা লিখেছেন? আর সেটা ২০০০ সালেই বা কেন? কারণ ২০০০ সালে ভারতীয় সংবিধানের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ছিল। সুবর্ণ জয়ন্তীতে লোক সংবিধান চর্চা করবেন এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে আম্বেদকরবাদী লোকেরা সংবিধানের বেশি চর্চা করেন। ৫০ বছরের পরে সংবিধান কতটা মহত্ত্বপূর্ণ থাকবে ইত্যাদি প্রশ্নের চর্চা আম্বেদকরবাদীরা করতে পারেন। এই ধরণের চর্চা যাতে না হয় বা কোনো প্রশ্ন যাতে আম্বেদকরবাদীরা না করেন, তার জন্য অরুণ শৌরি আগেভাগে বই লিখে জানালেন যে, আপনাদের বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী ছিলেন না। কারণ, আম্বেদকরবাদীরা প্রতিক্রিয়া দিতে ওস্তাদ। তখন তাঁরা লিখে জানাতে শুরু করলেন, না না, বাবাসাহেব স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী ছিলেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর কেন ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি

এবার আমরা একটু বাংলার দিকে চোখ রাখি। বাংলায় হরিচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মতুয়া ধর্মের প্রচলন করেন। তিনি মতুয়া ধর্মের অনুরাগীদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি সমাজকে আলোর দিশা দেখান।

এই আলোর দিশাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনিও সমাজকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাকের মধ্য থেকে তুলে আনার জন্য শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। খাবার না জুটলেও ভিক্ষা করে সন্তানকে পড়ানোর কথা বলেন। আর তিনি জনগণের মধ্যে জাগরণ ঘটানোর জন্য জানান–

"ব্রাহ্মণ রচিত যত অভিনব গ্রন্থ।
'ব্রাহ্মণ প্রধান' মার্কা বিজ্ঞাপন যন্ত্র।।" (গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ২৩)

তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত গ্রন্থকে বিজ্ঞাপন যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, সেখানে সুকৌশলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ করে তুলে ধরা হয়েছে। আর তাদের সার্বিক সুবিধার জন্য মূলনিবাসীদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ তৈরি করা হয়েছে। যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। এসব কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আরো বলেন–

"কথা উপকথা কত সৃজন করিল।
ঘাটে মাঠে গাছে পথে দেবতা গড়িল।।" (ঐ পৃঃ ২২)

"ধর্ম্ম ধ্বজাধারী সাজি যত পুরোহিত।
ধর্ম্মকে পিষিয়া করে কার্য বিগর্হিত।।"
"মাতৃত্ব সতীত্ব লয়ে করে হাস্যকর নীতি।।" (ঐ পৃঃ ২১)
আবার হরিচাঁদ ঠাকুর বলেন-
"কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব।।"

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ঠাকুর, ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ৯৪

এই ধরনের সমাজ জাগরণের বাণী যে মতুয়া ধর্মে দেখতে পাই সেটা নিশ্চয় সম্পূর্ণ আলাদা ও বৈদিকতা বর্জিত ধর্ম। গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তার আচার-ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেন। তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী হননি।

গান্ধিজি, চিত্তরঞ্জন দাসের মাধ্যমে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে চিঠি লিখে আহ্বান করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিতে। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই চিঠির জবাবে জানান–

"মহাশয়, আপনাকে জানাই যে, আমি আপনার আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি। কেউ কিছুর জন্য আমন্ত্রণ করলে তাঁকে সম্মান জানাতে হয়। তবে আমি অতি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমানে আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিরুপায়। আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করার পরে জানাতে চাই যে, আপনার এই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। আর কেনই বা আমার মন সাড়া দিচ্ছে না, তার বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে জানাতে চাই। তবে দোষগুণ বিচারের ভার আপনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি।

"অনুন্নত বলি যত আছে বঙ্গদেশে।
কোনভাবে দিন কাটে বেহালের বেশে।।
বিদ্যাশিক্ষা বেশী কিছু তারা শিখে নাই।
রাজকার্যে অধিকার তা'তে নাহি পাই।।
রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কভু নাহি ছুটে।
স্বাধীনতা কি পদার্থ বোঝে না'ক মোটে।।
রাজনীতি সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই।
অসহযোগের প্রশ্ন তার কিবা ভাই?" (ঐ পৃঃ ৪১৪)

বাংলার অনুন্নত জাতির লোকেরা অতি দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করে। 'বিলাসিতা' বলে তাদের কিছুই নেই। তারা অতি কায়ক্লেশে প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আছে। আবার আমাদের এই লোকদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রসারও তেমন ভাবে ঘটেনি। যার জন্য এরা কোনো রাজকাজেও অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আর

রাজনীতি করার কথা তো মাথায় আনার মত অবস্থা নেই। 'স্বাধীনতা কি পদার্থ'- সে কথা এরা কিছুই বোঝে না। কারণ, রাজনীতির সঙ্গে এদের কোনোরকম যোগাযোগ নেই। সেজন্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের প্রশ্নই আসে না। তবে–

"সত্যকথা দেশবন্ধু! করি নিবেদন।
এই পথে স্বাধীনতা আসেনা কখন।।
সমাজের অঙ্গে আছে যত দুর্ব্বলতা।
আগে তাহা দূর করা আবশ্যক কথা।।"(গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ৪১৪)

সত্যি কথা বলতে কি, দেশবন্ধু (চিত্তরঞ্জন), আপনাকে নিবেদন করিযে, আপনারা যেভাবে স্বাধীনতা লাভের কথা বলছেন, সেইভাবে সকলের জন্য কিন্তু স্বাধীনতা আসতে পারে না কখনো। সমাজের মধ্যে যত ধরনের দুর্বলতা আছে সেগুলোকে আগে দূর করা দরকার। এটাই অতি আবশ্যক কাজ।

"এই যে পতিত জাতি যত বঙ্গদেশে।
ইহাদের দুঃখ কেহ দেখে নাকি এসে?
কিবা খায়? কোথা পায়? কোন কার্য করে?
সন্ধান রাখে না কেহ কোন দিন তরে।।
দিনে দিনে এরা সবে হয়েছে হতাশ।
উচ্চবর্ণ হিন্দুগণে করেনা বিশ্বাস।।
আর এক মহাদুঃখ ইহাদের মনে।
উচ্চ হিন্দু ইহাদিগে "অস্পৃশ্য" বাখানে।।
কি কব দুঃখের কথা তোমার গোচরে।
দেবতারে ভাগ হিন্দু করেছে মন্দিরে।।
অস্পৃশ্য বলিয়া যারা পাইয়াছে আখ্যা।
মন্দিরে ঢুকিলে তার নাহি থাকে রক্ষা।।
পশু হ'তে এই মত হীন ব্যবহার।
অস্পৃশ্য জাতিরা সহে দেশের ভিতর।।
মাতৃ পূজা যজ্ঞ যদি কর আয়োজন।
একেলার পক্ষে তাহা সম্ভব কখন?" (গুরুচাঁদ চরিত পৃঃ ৪১৪)

এই বঙ্গদেশে যত নির্যাতিতরা বসবাস করে, তাদের যে দুঃখকষ্ট, এটা কি কেউ কখনও এসে দেখেছে? এরা কি খায়? খাবার কোথায় পায়? আর এরা কী কাজইবা করে? সে সব কিছুর কেউ কোনোদিন খোঁজ নিয়েছে কি? আজ এরা দারিদ্রের যন্ত্রণায় এবং এদের সঙ্গে পশুসুলভ অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার করার জন্য, এরা উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের আর বিশ্বাস করার মত অবস্থায় নেই। এদের তো আপনাদের

দেবতার মন্দিরেও প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে গেলে অস্পৃশ্য বলে গালি খেতে হয়। আর যদি কেউ ভুল করেও মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহলে তার সঙ্গে পশুর থেকেও হীন ব্যবহার করা হয়।

আজ আপনারা যে দেশমাতার পূজার জন্য যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, যাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই, তারা আপনাদের এই পূজায় কী করে যোগদান করবে? মাতৃপূজায় তো সকলের সামিল হওয়া দরকার। কিন্তু আপনারা যাদের অস্পৃশ্য করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তারা কী করে আপনাদের সঙ্গে যাবে বলুন?

রাজা যদি রাজসূয় যজ্ঞ করেন, সেখানে কাঙ্গালদের জন্য তো কোনো স্থান থাকে না। কারণ, রাজা তো সিংহাসনে থাকেন, আর কাঙ্গালেরা থাকে অনেক দূরে। তাহলে উভয়ের মধ্যে মেলামেশা কী করে হতে পারে? আপনি তো জানেন–

"অর্থনীতি, রাজনীতি, বিদ্যা কিংবা মানে।
উচ্চ হিন্দু জুড়ে বসে আছে সবখানে।।
সাহিত্যে বিজ্ঞানে কিংবা শিল্প সাধনায়।
বাংলার উন্নত হিন্দু শীর্ষস্থানে রয়।।
এই সব গুণে হীন আনুন্নত জাতি।
তাহারা কেমনে হ'বে তোমাদের সাথী?" (ঐ পৃঃ ৪১৫)

অর্থনীতি, রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা মান সম্মান সর্ব ক্ষেত্রে তো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা জুড়ে বসে আছে। শুধু এসবই নয়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে কিংবা শিল্প কলায় বাংলার উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা চূড়ায় বসে আছে। আর আমাদের অনুন্নত জাতির লোকেরা এসব গুণের ক্ষেত্রে হীন হয়ে আছে। তাই তারা কী করে আপনাদের সাথী হয়ে কাজ করবে?

আর একটা কথা স্পষ্টভাবে আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কজনই বা এগিয়ে আসছে? আপনাদের একভাই সরকারি কর্মচারী হলে আর একভাই উকিল। আবার অন্যভাই-এর আছে ব্যবসা। এবার উকিল তো ওকালতি ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী সাজলেও কর্মচারী ভাই অফিসে যাচ্ছে আর ব্যবসায়ী ভাই ব্যবসা করছে। মোট কথা তাদের অন্নের জন্য কোনো চিন্তা করা লাগছে না।

কিন্তু আমার জাতির লোকদের মধ্যে তো এমন কিছু নেই। তারা কোনোক্রমে কায়ক্লেশে সংসার চালায়। আমরা যদি স্বদেশী সেজে আন্দোলনে যাই, তাহলে তো আমাদের ঘরে উনুন জ্বলবে না। সকলকে উপবাসী থাকতে হবে। আর আমাদের সঙ্গে তো ইংরেজ সরকারেরও কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা হাল-গরু নিয়ে পাড়াগাঁয়েই থাকি। আমরা না চাকরি করি, না কাছারীতে যাই। তাই অসহযোগের প্রশ্ন আমাদের আসে না।

সেজন্য বলি কী, এসব আন্দোলনের কথা আমাদের কাছে না বলে বরং বঙ্গের

উচ্চবর্ণীয় হিন্দু কর্মচারীদের কাছে গিয়ে বলুন। আমাদের কাছে এই সব আন্দোলনের কথা বলা কিন্তু বৃথা।

অবশেষে আপনাকে আর কয়েকটি কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে– এই পথে সকলকে নিয়ে কাজ করার যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি যে কথাগুলো আপনাকে জানাচ্ছি সেসব গ্রহণ করুন।

"দলিত পীড়িত যত পিছে পড়ে আছে।
শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে যান তাহাদের কাছে।।
প্রকৃত দরদ যদি জেগে থাকে মনে।
কুলেতে উঠান সবে হাতে ধরে টেনে।।
'অস্পৃশ্যতা মহাপাপ' করুন রটনা।
প্রকৃত দরদ নিয়ে জাগান চেতনা।।
শিক্ষা, দীক্ষা অর্থ কিংবা সম্মানাদি দানে।
অনুন্নত জনে দিন সরল পরাণে।।
সকলে সরল এরা কুটীলতা নাই।
খাঁটি প্রাণে ইহাদিগে ভাই বলা চাই।।
ভাবিয়া দেখুন মনে দুই কোটী লোক।
চিরকাল বহিতেছে অবহেলা-শোক।।
বেদনার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিবা-রাতি।
এরা কিসে হতে পারে উচ্চবর্ণ সাথী?" (ঐ পৃঃ ৪১৫)

যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের ফলে নির্যাতিত, তাদের কাছে শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে যান। আপনাদের মনে যদি প্রকৃত দরদ জেগে থাকে তাহলে তাদেরকে এই ধর্মীয় ও জাতিগত অত্যাচার থেকে উদ্ধার করুন। তাদের প্রতি অস্পৃশ্য বলে যে ব্যবহার করা হয়, সেই অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা করুন। এদেরকে শিক্ষা দিন, সম্মান দিন। এরা ভীষণ সরল প্রাণের মানুষ। এদের মনের মধ্যে কোনো কুটিলতা নেই। তাই এদেরকে আপনারা সরল প্রাণে ভাই বলে কাছে টেনে নিন।

একটু ভেবে দেখুন তো, কয়েক কোটি লোক চিরকাল অবহেলাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। এদের সঙ্গে যদি দরদি বন্ধু হয়ে কাজ করেন, তাহলে হয়তো এরা আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে। আমার এই বার্তা আপনাদের গান্ধিজিকে জানাতে চাই। আশাকরি আপনারা আমার কথা ভেবে দেখবেন। তা হচ্ছে– আপনাদের এই আন্দোলনের জন্য যত শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, সেই শক্তিকে আমাদের এই নিম্নবর্ণীয় জাতির জনগণের উদ্ধারের জন্য ব্যয় করুন। ভারতবর্ষ পল্লীগ্রামের দেশ, এই পল্লীগ্রাম যদি আপনাদের সহায়তায় জেগে উঠতে পারে, তাহলে **"অবশ্য সুগম হবে স্বাধীনতার পথ।"** তাই আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই আপনারা শহর ছেড়ে পল্লী অঞ্চলে আসুন।"

এইভাবে পত্র লিখে গুরুচাঁদ ঠাকুর চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন।

দেখুন, পূর্বে অন্যান্য মহামনীষীদের কথার সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথা ও চিন্তাধারায় কত মিল। গুরুচাঁদ ঠাকুরও বলছেন– তিনি বা তাঁর লোকেরা ব্রাহ্মণের অধীন। তাই তিনি ব্রাহ্মণদের কবল থেকে মুক্ত করার কথা বলছেন। তিনি ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেননি বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার কথা বলেননি। বরং রাজাকেই বন্ধু মনে করার কথা বলেছেন। এ কথার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই–

> **"পতিত দলিত যত আছে বঙ্গদেশে।**
> **রাজা ভিন্ন বন্ধু নাই জানিবে বিশেষে।।" (ঐ পৃঃ ৩৫১)**
> **"দরিদ্র কাঙ্গাল জাতি বন্ধু কেহ নাই।**
> **রাজার বিরুদ্ধে কেন তবে মোরা যাই।।" (ঐ পৃঃ ১৭৩)**
> **তাই বলি স্বদেশীতে কাজ কিছু নাই।**
> **তা'তে দেশে স্থান মোরা পাই বা না পাই।।**
> **যেদিন বুঝিব সত্য আমাদের দেশ।**
> **প্রাণ দিয়া ঘুচাইব জননীর ক্লেশ।।" (ঐ পৃঃ ১৭৪)**

আমাদেরকে 'স্বদেশী সাজার' কোনো দরকার নেই। আর এর জন্য যদি আমরা এদেশে থাকতে পারি বা না পারি তাতে কোনো কিছু আসে যায় না। তবে হ্যাঁ, **সত্যি সত্যি যেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, এই দেশ আমাদের, আমাদেরও এই দেশের মানুষ বলে গণ্য করা হয়, সেদিন আমরা দেখিয়ে দেব দেশ কাকে বলে। তখন দেশের জন্য আমরা প্রয়োজনে প্রাণকে বলিদান করে দেশের মানমর্যাদাকে উপরে তুলে রাখবো। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের ধম্ম ও স্বাভিমানকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের আত্মর্যাদাকে লুণ্ঠিত হতে দেননি।**

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারত স্বাধীন হয়নি, ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এটা স্কুল-কলেজে পড়ানো হয়। আর দেশের জনগণ এত বছর ধরে এই কথা শুনতে শুনতে মেনেও নিয়েছে। পৃথিবীতে অন্য কোথাও এতবড়ো মিথ্যা ইতিহাস পড়ানো হয় না, কিন্তু ভারতে ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা পড়ানো হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের সে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল সেটা ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরণের প্রস্তাব। It was Transfer fo Power Bill and not India's Independence Bill.

ক্ষমতা হস্তান্তরণের যে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল তাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন–

১। লর্ড এড্‌উইন মাউন্ট ব্যাটেন

২। লেডি এড্‌উইন মাউন্ট ব্যাটেন

৩। জহরলাল নেহেরু।

ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা তথাকথিত স্বাধীনতার দিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই একই মিথ্যা প্রচার করে চলেছে যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারত স্বাধীন হয়েছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর। এক বিদেশী ইংরেজ চলে গেছে। যাওয়ার সময় তারা অন্য বিদেশী ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গেছে। এজন্য ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের এই দিনকে ক্ষমতা হস্তান্তরণের দিন বলা উচিত। এই মিথ্যা ইতিহাস পড়ানোর ফলে ভারতের মূলনিবাসীদের উপর খুব গম্ভীর পরিণাম হয়েছে। যদি সঠিক ইতিহাস পড়ানো হত, তাহলে ভারতের মূলনিবাসীরা বুঝতে পারতেন যে, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিন নয়, ক্ষমতা হস্তান্তরণের দিন। ভারতের মূলনিবাসী বহুজনরা তাঁদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে চালু রাখতেন। মূলনিবাসী মহামনীষীদের অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণদের তৈরি মিথ্যা ইতিহাসকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। এটাই সব থেকে বড় গোলক ধাঁধা হয়ে গেছে।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরদিন ১৬ আগস্ট ১৯৪৭ সালে সাহিত্য সম্রাট ও মহান শ্রমিক নেতা লোক প্রবোধনকর সত্যশোধক আন্নাভাউ সাঠে এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে র‍্যালী বের করেছিলেন বোম্বের আজাদ ময়দানে। এই র‍্যালী প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও হয়েছিল। সেদিন এতো বৃষ্টি হয়েছিল যে বোম্বের ইতিহাসে এত বৃষ্টি হয়নি। পূর্বেই কমিউনিস্টদের দ্বারা এই স্বাধীনতা বিরোধী র‍্যালীর বিরোধিতা করা সত্বেও হয়েছিল। প্রশাসনের বিরোধিতা সত্বেও হয়েছিল। অবশেষে কমিউনিস্টরা তাদের শ্রমিক কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিল কারখানায় স্বাধীনতা উৎসব পালন করার জন্য। যাতে শ্রমিকরা আন্নাভাউ সাঠের র‍্যালীতে অংশগ্রহণ না করতে পারে। তবুও ঐ র‍্যালীতে ২০ হাজারের উপর লোক হয়েছিল। এই র‍্যালীতে শ্লোগান ছিল-

এ আজাদী ঝুটি হ্যায়।
দেশকী জনতা ভুখী হ্যায়।।

এতে প্রমাণ হয় যে আন্নাভাউ সাঠেও ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগী ছিলেন না। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা পেয়েছে তাকে তিনি মান্যতা দেননি। কারণ, ওটা শুধুমাত্র ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণদের স্বাধীনতা ছিল।

আন্নাভাউ সাঠে সাংবাদিকদের বলেছিলেন– **'আরে গতকাল যে স্বাধীনতা এসেছে সেটাতে আমরা স্বাধীন হইনি। সেটা তো ওদের (ব্রাহ্মণ) স্বাধীনতা। আমরা আজকেও গোলাম হয়ে আছি। দারিদ্র পীড়িত হয়ে আছি।'**

এদেশে দুটো স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল। একটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ফল

ইউরেশিয়ান ব্রাহ্মণরা পেয়েছে ও ভোগ করছে। অন্য স্বাধীনতা অর্থাৎ মূলনিবাসীদের স্বাধীনতা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। ইংরেজরা চলে গেছে তাই আমরা ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মুক্ত হয়েছি। কিন্তু মানসিক দৃষ্টিতে আমরা এখনও ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার গোলাম হয়ে আছি। তাই আমাদের মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন হতে হবে। এর জন্য নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হবে।

এতো কিছু জানার পরেও কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, 'আমরা কি স্বাধীন নই? তার উত্তর অবশ্যই না। আমরা যেটুকু অধিকার আজ ভোগ করছি, সেটা মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাংলা থেকে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় পাঠানোর জন্য। বাবাসাহেব সংবিধানে মূলনিবাসীদের জন্য অর্থাৎ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি আর ধর্ম পরিবর্তিত লোকদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছেন। সেই অধিকার ভোগ করে তাঁরা নিজেদের স্বাধীন মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে মূলনিবাসীরা এখনো গোলাম হয়ে আছেন। মানসিক গোলাম। এই গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মূলনিবাসী বহুজন মহামানবদের বিচারধারাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার আন্দোলনের বিউগল বাজাতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক মূলনিবাসী বহুজনকে তন মন ধন দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

অনুবাদক - জগদীশচন্দ্র রায়

অনুবাদকের অন্যান্য বই-

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলন

নমঃশূদ্র কবে হল পূর্ব্বে তারা কিবা ছিল
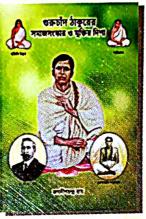
গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার ও মুক্তির দিশা
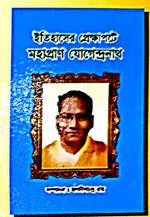
সম্পাদিত বই-

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ
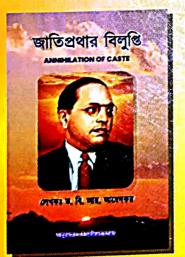
অনুবাদ গ্রন্থ-

জাতিপ্রথা বিলুপ্তি

পুণা চুক্তির দুষ্পরিণাম
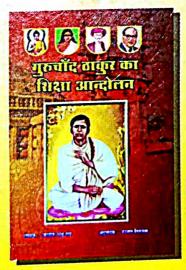
অনূদিত গ্রন্থ-

গুরুচাঁদ ঠাকুর কা শিক্ষা আন্দোলন (হিন্দি)

অনুবাদক উজ্জ্বল বিশ্বাস
9439200625
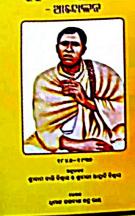
গুরুচাঁদ ঠাকুরাঙ্ক শিক্ষা আন্দোলন (ওড়িয়া)

অনুবাদক শ্রীদাম বিশ্বাস
9437129960